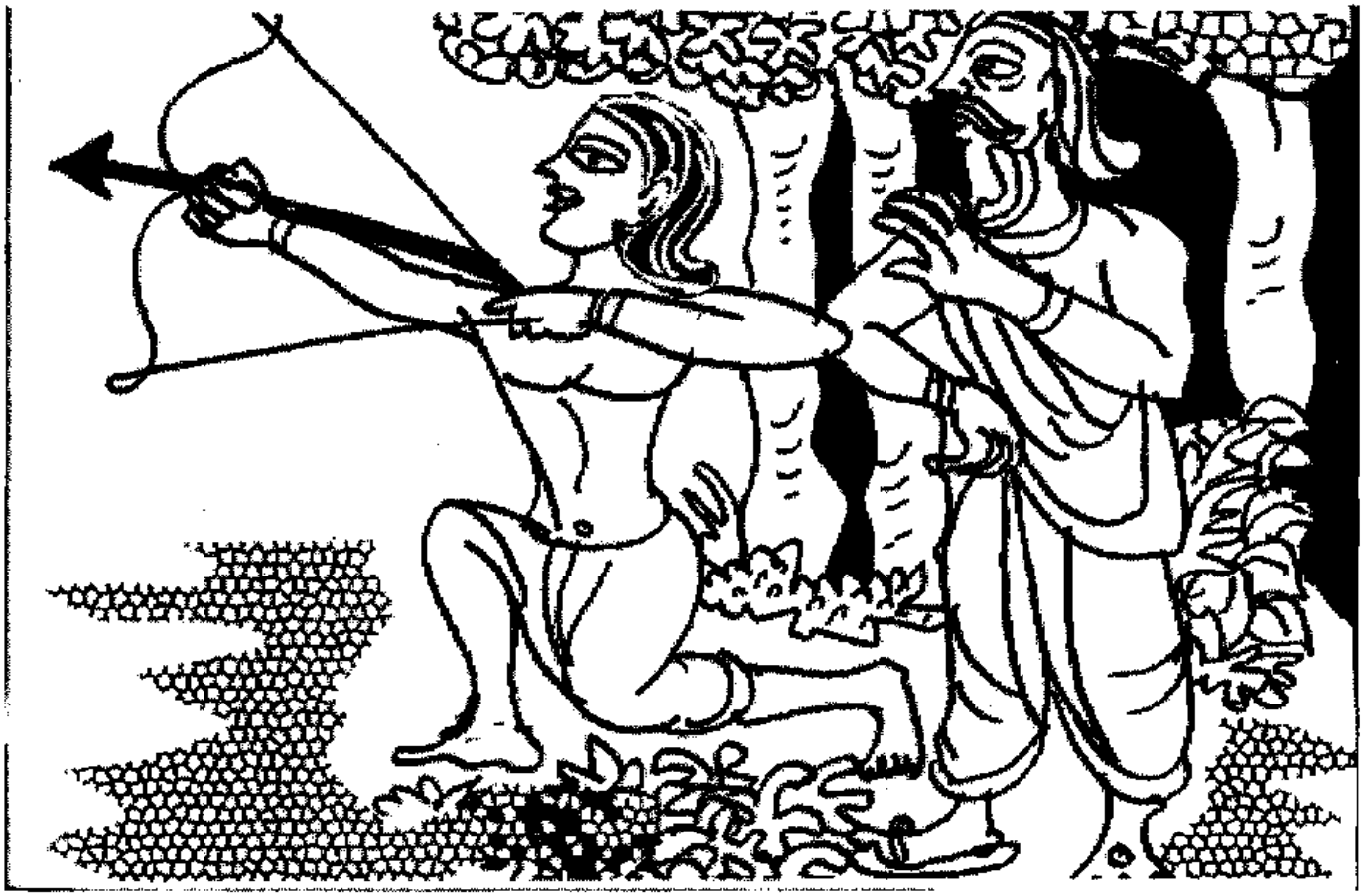

আরণ্যক ভারত এবং রামায়ণ-মহাভারত

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

(ভারতীয় মহাকাব্য/পুরাণ বিশেষজ্ঞ)

ভারতের সভ্যতা অরণ্য নির্ভর। আমরা অরণ্যের উপর নির্ভর করেছি, ভরসা রেখেছি। এই অরণ্য নিয়ে যে প্রাচীন ভারত; সেখানে ক্ষুধার বিরাট জায়গা ছিলো এটা আমি মনে করিনা. ভারতীয় সভ্যতার শুরু থেকেই ক্ষুধাকে আমরা ভাগ করে নিতে শিখেছি। দান করতে শিখেছি।

ছোটো বেলায় এমন গল্পতো প্রায়ই শুনতাম। সংসারী গৃহস্থ মনের দুঃখে বনে চলে গেল। তারপর বনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে কোনো ভালোমানুষ ভুত বা রাক্ষসের সঙ্গে দেখা হল, তারপর তার কাছ থেকে বিদ্যে পেয়ে গ্রামে ফিরে এল বড়োলোক হয়ে— এ-সব কত কিছু শুনেছি। এমনকি আমাদের সপ্তশতী চণ্ডী শুনতে গেলেও সেই একই কথা— মন্ত্রী-অমাত্য-সেনাপতিদের দুর্ব্যবহারে সুরথ রাজা মনের দুঃখে

একা একটি ঘোড়ায় চেপে বনে চলে গেলেন— একাকী হ্যয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্। সেই ছোটোবেলায় এটা ভাবার সুযোগ পাইনে যে, গহন বনের মধ্যে একটা মানুষ চলা-ফেরা করবে কীভাবে? লোকটা খাবে কী, শোবেই বা কোথায়? সবচেয়ে বড়ো ভাবনা হল— সুরথ রাজা বনে-বনে ঘুরে বেড়ালেন, অথচ কোনো বাঘ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল না, একটি হিংস্র জন্তুও তাঁর গায়ে আঁচর কাটল না বা কোনো দস্যুও তাঁকে আক্রমণ করল না। বরঞ্চ তিনি বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটি সমমনস্ক বন্ধুও জোগাড় করে ফেললেন এবং আরও খানিক গিয়ে এক দার্শনিক মুনির গলায় অপূর্ব মন্ত্রধ্বনি শুনতে পেলেন। আরম্ভ হয়ে গেল সপ্তশতী চণ্ডী।

সত্যি বলতে কী, অত তলিয়ে ভাবিনি কখনও। আর এটাও তো ঠিক যে, মনের দুঃখ হলেই লোকে বনে যাবে, অথবা বুড়ো হয়ে বৈরাগ্য এলে তবে বনে যাবে, এমনটা্য সঠিক কথা নয়। সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, আমোদিনী সরসরতার জন্যও বনের মহিমা কম নয়, যেমনটি কবিগুরু বলেছিলেন—

পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

কবির কথায় কথায় বৃদ্ধ বানপ্রস্থী আর যৌবনের বানপ্রস্থীর মধ্যে রসতাত্ত্বিক প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যাবে বটে, তবে ভারতবর্ষের ধর্মদর্শন বন-অরণ্যের মধ্যে মানবিক মহদাশয়তা দেখতে পেরেছে দার্শনিক কুতূহলেই। রাজাও যখন তখন অরণ্যে যান। মানুষরা তো যাবেই। বনে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না। রামায়ণ ও মহাভারতে দুটো শাস্তি-র কথাই ধরা যাক্। রামের এবং পাণ্ডবদের বনে যাওয়া। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। অন্য কোথাও নয়। একেবারে বনবাস। তাও ১৩-১৪ বছরের জন্য। আসলে অরণ্যে যাওয়াটা মানুষের অভ্যাসের মধ্যে ছিলো। ক্ষুধা বলতে এমনিতে যা বোঝায় তার সঙ্গে অরণ্যের সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। এই অরণ্যে রাম-লক্ষণ কিংবা পাণ্ডবরা এমন ভাবেই মনোরম পরিবেশে বসবাস করতেন যে তাদের ফের রাজপুরীতে ফিরে যাবার বাসনাটাও অনেকাংশে কমে যেত। রামায়নের এক জায়গায় রাম বলছেন আমরা অযোধ্যতেও আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করেনা। এমনকি সীতাকে পরিত্যাগের সময়, যদিও এটাকে অনেকেই উত্তরকান্ডে আছে বলে প্রক্ষিপ্ত বলে। আমি সেটা মনে করিনা। কারণ আমারও কিছু লেখাপড়া আছে। যখন থেকে ওরাল হিস্ট্রি স্বীকৃতি পেয়েছে। গুরুত্ব পেয়েছে তখন থেকেই সবকিছুর ইতিহাস। ধারণাটাও বদলে গেছে। কারণ ওরালিটি একটা উপাদান। সেদিক থেকে ভাবলে মানুষ সব সময় ক্ষুধার তাড়নায় অরণ্যে যেত সেটা ঠিক নয়। বৈরাগ্যের জন্য যেত। সেটাও ঠিক না। যৌবনেও যেত। রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেন সে কথা। কেউ যদি বলেন আমি এসব কথা বলছি, আর্য্যতা

নির্ভর গ্রন্থ কিংবা দার্শনিক চিন্তা ভাবনা থেকে, তা নয়। এসব আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যেই আছে। আমরা বলি অতিথি নারায়ণ। যিনি তিথি মেনে বাড়ীতে আসেন না তাকে সম্মান জানাই। সেই কবে থেকে আমাদের মায়েরা রান্নার সময় একটু ভাত বেশী রাখতেন, অতিথি নারায়ণের যাতে সেবা করা যায়। একটা সময় ছিলো মানুষ মানুষের সাথে কথা বলতো। আমাদের সময়টা ছিলো অনেক ব্যাপ্ত, বিশাল। এখনকার মত নয় যে SMS করে বলবো আপনার কখন সময় হবে। একটু কথা আছে। আমি উত্তর কোলকাতায় বুকের কাছে গেঞ্জি তুলে যে সব মানুষকে গল্প করতে দেখতাম সেটা আর নেই। আমি নিজে দেখেছি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী জগুবাবুর বাজারে পেটের ওপর গেঞ্জি তুলে বাজার করছেন, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে লোকের সাথে কথা বলছেন। মহাভারত যখন শুরু হচ্ছে শ্রোতার আসনে রাজা বসে। তাকেও বলা হচ্ছে ধৈর্য্য ধরুন, তাড়াহুড়ো করবেন না'। সময় নিয়ে শুনুন। ছেলেবেলায় বাড়ীতে দেখেছি বাবা মাকে বলতেন— তোমাকে সবসময়ই বলতে শুনি অতিথি নারায়ণ। তা তোমার এত নারায়ণ? তখন আমাদের খুব খারাপ অবস্থা। দিন আনি দিন খাই। তাও মা অতিথির জন্য চাল নিতে ভুলতেন না।

ফিলোজফি সমাজ বহির্ভুত উপাদানে তৈরি হয় না। সেটা সব ধরনের সমাজ বিজ্ঞানীরাই মেনে নিয়েছে। রামায়ন, মহাভারত, পুরাণে বারবার বলা হচ্ছে— কিসের অভাব? আগে, তোমার যাওয়ার জায়গাটা ঠিক করো। Satisfaction levelটা ঠিক করতে হবে, তা হলে তুমি অল্প পাওয়াতেই ধনী হয়ে যাবে। নইলে কোটি কোটি অর্থ পাবার পরও গরীব থেকে যাবে। কারণ তোমার যে আরও চাই। কিছুতেই তুমি সুখ, শান্তি পাবে না। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করছেন। কে সুখী? যুধিষ্ঠিরের জবাব— যে স্বদেশে, যে অঋণী, যে দিনান্তে বৃক্ষ তলে বসে শাকান্ন আহার করে। সংস্কৃতে একটা পদ আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণুর পদ চাইছেন। হরি 'হর'র পদ চাইছে। এই অসন্তুষ্টি, এই দৌড় এর তো কোনো শেষ নেই। পুরাণে একটা সুন্দর কথা আছে—

"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রপা! পরভৃত; সরিতো' পশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিম জিতো' বতি ন প্রপন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধন দূর্মদান্ধান্।।

এখানে কবয়ো মানে শুধু Poet নয়। কবয়ো মানে পণ্ডিত বিদ্বান। তারাও কেন ধন দুর্মদের পেছনে ছুটছে। ভাগবত পুরাণে তক্ষক-দংশনে ভীত রাজা পরীক্ষিৎ যখন ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের কাছে ভাগবতী কথা শুনতে চাইছেন, তখন শুকদেব এই মর্ত্য জগতের ভোগ্য বিষয়গুলি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার উপায় শিখিয়েছেন প্রথমে। তারপর তিনি বলেছেন— এত চিন্তা কীসের রাজা! তুই ধরিত্রী-মায়ের ন্যাংটো ছেলে, তুই ন্যাংটা হয়ে থাক্ না এই পৃথিবীতে, দরকার কী তোর কাপড়-চোপড় পরে—

দিগ্‌বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ! এই বিরাট পৃথিবীর ভূমিশয্যা বিছোনো আছে তোর জন্য, তোর বিছানার কী প্রয়োজন? প্রয়োজন কী তোর বালিশের, যেখানে হাত দুটি ভাঁজ করে মাথায় দিলেই হয়! দুহাত জুড়ে হাত পাতলেই তো অন্নপাত্র, তোর বাটি-ঘটি-গেলাসের কী দরকার? যদি বলিস, ন্যাংটো থাকতে লজ্জা পাই; আর দুই হাতও না হয় জুড়ে অঞ্জলি রচনা করলাম, কিন্তু অন্ন পাবো কোথায়— তাহলে বলি, অক্ষম বোকা লোক নয় রে শুধু, বিদ্বান-পণ্ডিতদেরও এই সমস্যা আছে। বিদ্বান-পণ্ডিত মানুষেরা যে কেন বড়ো- লোকদের পিছন পিছন ঘোরে, কেন যে তারা ঐশ্বর্যমত্ত মানুষের সেবা করতে যায়, সে আমি একেবারেই বুঝি না, বাপ! যদি বলিস, না চাইলে পাবো কী করে, তাহলে বলি— বেরিয়ে পড়্ ঘর থেকে, রাস্তায় চল, চলতে থাক বনের পথে। দেখবি কত গাছ আছে, তাদের কাছেই তুই লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পাবি, পাবি গাছের বাকল, লতা-পাতা। পরের জন্য তারা এখনও সবচেয়ে বেশি ভাবে, তারাই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ফল দেবে তোর জন্য। সেই গাছ তো এখনও শুকিয়ে যায়নি, শুকিয়ে যায়নি সব নদী, যারা তৃষ্ণার জল দেবে তোকে— নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতো' প্যশুষ্যন্। এখনও শত শত পাহাড়ের অনন্ত গুহামুখ রুদ্ধ হয়ে যায়নি যে থাকতে পাবি না কোথাও। আর কিছুই যদি না জোটে তো ভগবান শ্রীহরির নাম নিয়ে বসে থাক, তিনি কি আশ্রিত জনকে ফিরিয়ে দেবেন? কক্ষনো না। কিন্তু তবু লোকের ভরসা নেই, তবু বিদ্বান মানুষ পর্যন্ত বড়ো-লোকের পোঁ ধরে থাকবে— কস্মাদ্‌ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্!

এই ভাগবত-শ্লোক আমরা মানুষের বৈরাগ্য জাগ্রত করার জন্য উদ্ধার করিনি। আমরা প্রধানত বলতে চেয়েছি— অরণ্যের বৃক্ষ, অরণ্যের ফল-মূল এবং বৃক্ষচর্মও মানুষকে কতটা নির্ভরতা এব নিশ্চিন্ততা দিতে পারে যাতে ঐহিক জীবনের বৃত্তি-লাভের জন্য অর্থী পুরুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। হয়তো জীবনধারণের জন্য বনের ওপর নির্ভর করার কথাটা আজকে বেমানান শোনাবে, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতার একটা বড়ো অংশই জুড়ে আছে ভারতবর্ষের বন অরণ্য! যদি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দিক থেকেও ব্যাপারটা দেখা যায়, তাহলে বলতেই হবে— সপ্তসিন্ধু বা পঞ্চ নদীর তীরে এসে যাঁরা নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা তো প্রথমেই বাস করার জন একটা গ্রাম-শহর পাননি। বন-অরণ্যই তাঁদের প্রথম আশ্রয় ছিল। তারপর বসতি এবং খাদ্যের প্রয়োজনেই যেমন বন ধ্বংস করে, মানুষ কিংবা নগরায়ণের জন্য বন কাটে, ঠিক সেইভাবেই সরস্বতী-দৃষদ্‌বতীর প্রথম তীরবসতি গড়ে উঠেছিল, তারপর গঙ্গা-যমুনার তীর ধরে, সদানীরা গণ্ডকী পর্যন্ত, এবং তারও পরে পূর্বদিকে একেবারে এই বঙ্গদেশ, আর দক্ষিণে বিন্ধ্য পেরিয়ে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড শেষ করার পর বনারণ্য খানিক খানিক অগ্নিতে আহুতি দিয়েই নিজেদের থাকার জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন আর্য-ভাষাভাষী অভিজনেরা।

বসতিস্থাপন এবং নগরায়ণের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু বনধ্বংস করলেও মূলত পশুপালক আর্য জনগোষ্ঠী বনারণ্যকে অবহেলা করেননি কখনও। আর যদি এই মতবাদ মেনেই নিই যে, পুর্বোষিত অনার্য জনজাতিকে পর্যুদস্ত করেই আর্যরা তাঁদের অধিকার কায়েম করেছিলেন, তাহলেও মানতে হবে— বনারণ্যের প্রতি অনার্য জনজাতির ভালোবাসাও অধিকারী আর্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না, বরং ছিল অনেক বেশি। তার প্রমাণও পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধের বৃহত্তর পরিসরে। তবে কিনা বেদ-উপনিষদ-আরণ্যক থেকে এ-সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেবার আগে যাঁর অনুভূতির দর্পণে প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃত রূপটি সমস্ত পূর্ণতা নিয়ে ধরা পড়েছিল সেই রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের আগে উল্লেখ করতে হবে। তিনি লিখেছেন—

"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় না, বরঞ্চ তার চেতনাকে আলো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি— যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, না হয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যে নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।

এইরকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি। এইজন্য সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরাভিমুখী হয়নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে।

যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেই জন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন— যদিদং কিঞ্চ সর্বং

প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইট-কাঠ-লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফুলফল দিয়েছে, কুশ-সমিধ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবন, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন।"

মহাকবি যে কাব্যসরসতায় বিমূঢ়-মুগ্ধ হয়ে এই সব কথা বলেছেন, তা আমরা মনে করি না, প্রাচীনকে তিনি এতটাই অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন যে তাঁর বহুতর গভীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ভারতীয় বন-অরণ্যের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন। কী তাদের নেই। পরিধান করার জন্য গাছের ছাল নেই? আহারের জন্য গাছের সব ফল কি ফুরিয়ে গেছে? পানের জন্য নদীর সব জল কি শুকিয়ে গেছে? অরণ্য নির্ভরতা ভারতের দর্শন। কারণ ঈশ্বরের কথা ছেড়েই দিলাম। একথা বিশ্বাস করতে বলছি না যে তিনি আমাদের জন্য সবকিছু সাজিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এই জাগতিক ব্যাপরটা অস্বীকার করি কি করে? অরণ্য আমাদের অন্য সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছে।

আমাদের একটা আবশ্যক শাস্ত্র আছে। একটা দুটো নয়। Series of Books। তারমধ্যে আছে— ঐতরেয় আরণ্যক। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সাংখ্যায়ন আরণ্যক। সেই অরণ্যে বসে এ ধরনের শাস্ত্র লেখা হয়েছে। অধ্যায়ন করা হয়েছে। এক অনন্ত শান্ত পরিবেশ। গ্রাম ছাড়িয়ে অরণ্যের শুরু। নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে হতে সেখানে শেষ। যেখানে হিংস্র জীবের চরাচর শুরু। এখানে ক্ষুধার ততটা তাড়না নেই। এই সব গ্রন্থে অরণ্যের অনুপম বর্ণনা আছে। যা লেখা হয়েছে আজ থেকে সাড়ে চারা হাজার বছর আগে। Maxmullar-এর মত বহু বিদেশী সাহেবরা তাঁদের অনুসরণকারী কিছু দেশীয় সাহেব মানতে চান না খ্রীস্টের জন্মের আড়াই তিন হাজার বছর আগে এসব লেখা হয়েছিলো। তারা এটাকে টেনে দেখাতে চান অত আগে কিছু লেখা হয়নি। যা কিছু খ্রীস্টজন্মের আশেপাশে।

এ-কথা বলাই বাহুল্য, আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় জনজীবনের তথা সাংস্কৃতিক যে প্রতিবিম্বপাত ঘটেছে, যেখানে অভিজ্ঞান হল আরণ্যক গ্রন্থগুলি। অরণ্যের শান্ত বনচ্ছায়ায় হয়তো এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলেই এগুলির মধ্যে প্রকৃতির

পাঠ যেমন মধুর তেমনই মধুর এবং ব্যাপ্ত তার আরণ্যক ব্রহ্মসমাধি। সবচেয়ে বড়ো কথা, পৃথিবীতে এমন গ্রন্থের সংবাদও কেউ দিতে পারবে না, যেখানে প্রধান শর্তটাই হল অরণ্যের ছায়ায় বসে আরণ্যক গুরুর সামনে শিষ্যকে এই আরণ্যক গ্রন্থ পড়তে হবে, পড়তে হবে ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যকের গ্রন্থারম্ভেই সায়নাচার্যের মতো টীকাকারকে প্রথমেই আরণ্যক শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলতে হয়েছে— এই গ্রন্থ অরণ্যের মধ্যে পড়তে হয় বলেই এর নাম আরণ্যক— অরণ্যে এর পাঠ্যত্বাদ্ আরণ্যকমিতীর্য্যতে। কেমন এই অরণ্য, যেখানে বসে শান্ত মনে পড়াশুনো করা যায়— তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেছে— যেখানে থাকলে জনবসতির একটি উপরিতল ছাদও দেখা যায় না, সেটাই আরণ্যক মানুষের অভীষ্ট বসতি।

ভারতীয় সভতার প্রথম কল্পে বন-অরণ্য কতখানি মানুষের উপকারে এসেছে, তার একটা পরম বিশ্বাস্য প্রতিচ্ছবি প্রাচীন দুটি পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু পুরাণের চেয়েও অনেক-অনেক প্রাচীন এই আরণ্যক গ্রন্থগুলি এবং সবচেয়ে প্রাচীন সেই ঋগ্বেদ, যেখানে গভীর অরণ্যানী দেবতার সম্মানে মন্ত্রবর্ণের মধ্যে স্থান পেয়েছে। দেবমুনি নামে একটি ঋষি দিগন্তে বিলীন অরণ্যানী দেখতে দেখতে সোচ্ছ্বাসে মন্তব্য করেছেন— হে আমার বৃহৎ নিবিড় অরণ্য! তুমি যেন দেখতে-দেখতে কত দূরে কোথায় হারিয়ে যাও, আর যেন বোঝাই যায় না, কত দূর পর্যন্ত তুমি আছ। আমার শুধু প্রশ্ন জাগে মনে— তুমি কেন কখনও গ্রামে যাবার পথ জিজ্ঞাসা করো না। তোমার কি একা থাকতে ভয় লাগে না একটুও— কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী।

এই মন্ত্র আসলে অরণ্যবাসী অথবা অরণ্যাচারী এক মানুষের অনুভব। সে আদিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যানী দেখে তার অন্ত খুঁজে পাচ্ছে না এবং বনের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে তার ভয়-ভয় করছে। তাই নিজের ভাবনা সে অরণ্যের ওপরে চাপায় এবং ভেবে অবাক হয় যে, তার সঙ্গে যারা থাকে তারা কেউ আর গ্রামের কথা ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু অরণ্যের বৈরাগ্য-সংসারে দেবমুনি বোধহয় নতুন কোনো আগন্তুক। তাঁকে রেখে তাঁর আরণ্যক সহজীবীরা বোধহয় ফলমূল সমিদাহরণে গেছেন, তাই একা-একা তাঁর ভয় করছে। বনের মধ্যে ভেসে আসছে পশুপাখির বিচিত্র শব্দ, কেউ ষাঁড়ের মতো গম্ভীর শব্দ করছে, কোনো পাখি যেন তার উত্তর দিচ্ছে চিঁ-চিঁ করে। একেবারে ধ্বন্যাত্মক শব্দে দেবমুনির দেবভাষা এখানে একেবারে ডিকনস্ট্রাকটেড— বৃষারবায় বদতে যদুপাবদতি চিচ্চিকঃ— যেন বৃহৎ বীণার ঘাটে ঘাটে উদারা আর তারায় বিচিত্র সুর আসছে নেমে। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে আলো-ছায়ার এমন মায়া তৈরি হয়েছে, যাতে অচিরাগত বনে-আসা ঋষির মনে হচ্ছে— কোথায় যেন গোরু চড়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় যেন লতায়-পাতায় আলো-ছায়ায়— কোথায় যেন একটা বাড়ির মতো দেখা যাচ্ছে আর সন্ধ্যা নামলেই যখন যামিনী তার শয়ন বিছিয়ে দিতে থাকে, তখন ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষপত্রের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে চাঁদের আলো প্রবেশ করে এমন এক

মায়া তৈরি করে, যেন শত শত শকট বেরিয়ে যাচ্ছে সেই পুরাতন বাড়িটা থেকে, অরণ্যের মধ্যে যে প্রথম এসে বাস করতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যাবেলায় তার এই অনুভব হয়ই, যেন, চিৎকার করে ডেকে উঠল কেউ— বসন অরণ্যানাং সায়ম্ অক্রুক্ষদিতি মন্যতে— কেউ যেন গলা চড়িয়ে গোরুগুলিকে ঘরে ফিরতে বলছে, খটাখট্ শব্দ করে কেউ যেন কাঠ কাটছে— গাম্ অঙ্গৈষ আহ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।

আসলে এ সকলি 'মনে হওয়া'। বনের মধ্যে বিচিত্র পশু, বিচিত্র তাদের শব্দ, রাতের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার খেলায় কত না বিকীর্ণ অনুভূতি। কিন্তু আজ থেকে অন্তত তিন হাজার বছর আগে এক অরণ্যচারী আরণ্যক মুনি অরণ্যের এই কবিতা কিন্তু লেখেননি, তিনি এই কবিতা দর্শন করেছেন তাঁর মন্ত্রচক্ষু দিয়ে। অরণ্যের মধ্যে এত মায়া, এত ভ্রান্তি, এত শব্দ শুনেও স্রষ্টা ঋষি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন— বাস্তবে অরণ্যানী কারও প্রাণ বধ করে না, অন্য কোনো হিংস্র পশু শ্বাপদ না এলে এখানে কোনো আশঙ্কা নেই— ন বা অরণ্যানী হন্তি অন্যশ্চেন্ নাভিগচ্ছতি। এমনও নয় যে খাবার অভাবে পেট শুকিয়ে মরতে হবে এখানে। এখানে গাছে গাছে স্বাদু ফল আছে, সেই ফল খেয়ে পরম সুখে দিন কাটানো যায়— স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায় যথাকাম্যং নিপদ্যতে। আরও একটা ব্যাপার আছে এই নির্জন বনানীর মধ্যে— এই অরণ্যের একটা গন্ধ আছে, যাঁরা এখানে থাকেন, যাঁরা এই অরণ্যানীকে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে এই গন্ধ মৃগনাভির সৌরভের মতো, এখানে আহার আছে প্রচুর এবং বহুবিধ, অথচ কৃষক নেই একজনও— আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নাম্ অকৃষিবলাম্।

কৃষি নেই অথচ আহার আছে, অন্নপান জোগাড় করার মানসিক ব্যায়াম নেই, কায়িক শ্রম নেই, অথচ বৈরাগ্যভ্যাস এবং সন্তুষ্টি যদি কিছুমাত্রও থাকে, তবে যে অরণ্যও মানুষ্য সমাজের পরম আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে, সে-কথা ঋষি দেবমুনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি বুঝেছেনে গভীর অরণ্যানী যদি বিচিত্র-প্রাণী-পশুদের আশ্রয়দাত্রী জননী হয়ে উঠতে পারে, তবে মানুষও তো প্রাণীই, অতএব অরণ্য কেন মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠবে না। আসলে এটা আমরা জানিই যে, কাম-লোভ-মোহ আমাদের এতই বেশি, আমরা নিস্তরঙ্গ অরণ্যজীবনে ফিরে আসতে পারি না, কিন্তু মুনির ভাবনা হল— লোভ-লালসা সামাজিক উচ্চাশা যদি আমাদের পদে পদে আবিল না করে তোলে, তবে অশেষ মৃগকুলের জননী এই অরণ্যানী আমাদেরও আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে, মুনি তাই অরণ্যানীর গীত গাইছেন মন্ত্রবর্ণে— প্রাহং মৃগাণাং মাতরম্ অরণ্যানিমশংসিষম্।

আর সত্যিই তো, অরণ্য ভারতবর্ষের অনন্ত বুদ্ধিমান মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বহন করে আমাদের আরণ্যক গ্রন্থগুলি—

ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সাংখ্যায়ন আরণ্যক। এইসব গ্রন্থ অরণ্য ছাড়া পড়াই যাবে না— অরণ্যে এর পাঠ্যত্বাদ্ আরণ্যকমিতীর্য্যতে। তার মানে সভ্যতার আর্যায়ণে অরণ্য একটা অংশই বটে এবং সংসার এবং সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমরা এই অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিনি, অরণ্যকে আমরা গ্রহণ করেছি বৈরাগ্যের শুদ্ধতায়, তপোভূমির মহিমায়। তবু একটা ঐতিহাসিক বাস্তব বোধহয় সেইখানে, যেখান থেকে গ্রাম্যকুটিরের একটি ছাদও দেখা যায় না। আমাদের ধারণা— এটা সেইরকম কোনো অবস্থান, যেখান থেকে গ্রাম্যবসতি অনেকটা দূরে, অর্থাৎ গ্রাম ছেড়ে, গ্রামের ঘরবাড়ির দৃশ্যপট ছেড়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি বটে, কিন্তু এটা এমন গভীর অরণ্য নয়, যেখানে আমরা বাঘ-ভালুকের সঙ্গে বসবাস করছি। অর্থাৎ এটা গ্রাম থেকে অনেক দূরে এবং গ্রামের লোক এটাকে অরণ্যই বলবে, কিন্তু মানুষ যেখানে নির্জন প্রকৃতির আস্বাদন করছে, সেটা শ্বাপদভূমির প্রান্তদেশ, অথচ তেমন শ্বাপদসংকুল নয়, শ্বাপদের খোঁজে যেতে হলে আরও যেতে হবে বনের গভীরে। বস্তুত এইরকম অরণ্য-আবাসেই ঋষিদের তপশ্চর্য্য; তপস্বীর তপোবন, মহাকবির কাব্যসাধনার স্থান অথবা নির্বিঘ্ন মানুষের বৈকল্পিক বাসস্থান।

অথবা, এটাও তো ভাবা দরকার— যখন ঘরবাড়ি-গ্রামশহর তৈরি হয়নি, যাযাবর-বৃত্তি আর্যরা যখন স্থান থেকে স্থানান্তরে, বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন বনই তো ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয়, বনের ফলই তো ছিল তাদের প্রধান আহার এবং মর্মরপত্রমোক্ষা বনস্থলীর পর্ণ দিয়েই তো রচিত হত পর্ণশয্যা। মৎস্যপুরাণ এই সভ্যতার মুখটুকু দেখার পর মন্তব্য করেছেন— বন্যবৃক্ষের ইতস্তত বিসারিণী শাখার শাখার বিন্যাস দেখেই মানুষ প্রথম বাড়ি বানোনোর রহস্য খুঁজে পেযেছে, আর বৃক্ষের 'শাখা' থেকেই 'শালা' বা ঘর-বাড়ি বানানোর ধারণাটা শব্দ গঠনেও প্রাসঙ্গিক।

আমরা জানি যে, ভারতবর্ষে যে মুহূর্ত থেকে বসতি তৈরি হয়েছে, তার পর থেকেই এটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার সমস্ত অঙ্গগুলো, বিশেষত জনপদ, গ্রাম, নগর, রাজধানী, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানব-গোষ্ঠীর ভৌগোলিক পরিচিতি তৈরি হবে, সেখানে গ্রাম-নগরের পত্তন তো হবেই হবে। কিন্তু এই গ্রাম-শহর তৈরি করেও ভারতবর্ষের শতসহস্র বিদ্বান-বুদ্ধিমান মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গেল বন। আমাদের যে আদিকাব্য লেখা হল, যেখানে ভঅরতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচিত হবে, সেই রামায়ণের মহাকবি কিন্তু আরণ্যক মুনি। তাঁর মহাকাব্য সৃষ্টির আরম্ভটাই হচ্ছে এক আরণ্যক পটভূমি থেকে। বাল্মীকি নারদমুনির কাছে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিলেন, আদর্শ মানুষ হিসেবে রামচন্দ্রেরকথা শুনেছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁর কবিতার অভ্যুদয় হয়নি. ভিতরে সৃষ্টিশীল মন অপূর্ব

নির্মাণের কৌতূহলে আছে, কিন্তু তার প্রকাশের বাহন নেই। এই অবস্থায় তিনি স্নান করতে এসেছেন তমসার জলে। কী অদ্ভুত এই নদীন নাম— তমসা। আকাশের নীল এই নদীর স্বচ্ছ জলে তমচ্ছায়া ফেলে কিনা, তা স্পষ্ট করে বলেননি মহাকবি, কিন্তু গঙ্গার অদূরেই এই তমসার তীরেই বাল্মীকির আশ্রম এবং আপাতত এক সৃষ্টি সংভিন্ন মন নিয়ে বাল্মীকি তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজের সঙ্গে স্নান করতে এসেছেন তমসায়।

সময় তো তখন এমন ছিল না যে, আদিকবির বড়ো তাড়া আছে, তাঁকে অফিস যেতে হবে অথবা বাজারের থলে হাতে যেতে হবে বাজারে। তমসার তীরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই যে তিনি ঝপাং করে জলে লাফ দিয়ে স্নান করতে নেবে যাবেন তাও নয়। তমসার তীরে এসে প্রথমেই আন্দোলিত হলেন জল দেখে। উদ্বেল হৃদয়ে ডাকলেন শিষ্যকে— দ্যাখো, ভরদ্বাজ! জল দ্যাখো, ঘোলা জলের লেশ মাত্র নেই, এমনই টলটলে আর স্বচ্ছ এই জল, যেন সৎ মানুষের সরল মনটুকু জলের রূপ ধারণ করেছে— রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যনো যথা। বাল্মীকি বললেন— আমি এই নদীতে স্নান করবো ভরদ্বাজ, তুমি হাতের কলশ মাটিতে রেখে আমার বল্কলটি দাও। ভরদ্বাজ বল্কল দিলেন বটে, কিন্তু জলে নামা হল না কবি-ঋষির। চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্ত বনস্থলী, মর্মর পত্রমোক্ষে ছেয়ে আছে ভূমিতল। মুনির চোখ পড়তেই তিনি স্থির থাকতে পারলেননা। তাঁর স্নান করা হল না আর, বিস্তীর্ণ বনের চার দিকে তিনি ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, দেখতে লাগলেন বনের শোভা গাছগাছালি, পাখপাখালি— বিচচার হ পশ্যন্তং সর্বতো বিপুলং বনম্।

বনের চারদিক দেখতে দেখতেই তো সেই নিষ্ঠুর কঠিন ঘটনাটা ঘটে গেল। বনেচর ব্যাধ অব্যর্থ শরক্ষেপে ক্রৌঞ্চমিথুনের একতর কৌঞ্চকে মেরে ফেলল বাল্মীকির সামনেই। ক্রৌঞ্চমিথুন তখন বন্যান্তে মিলনরত অবস্থায় ছিল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চটিকে শরাঘাত করতেই সেটি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পড়ে গেল গাছেরডাল থেকে নীচে, আর তাকে রক্তাপ্লুত দেখে ক্রৌঞ্চী ব্যাকুল স্বরে ডাকতে লাগল। এমন করুণ সেই বিলাপ যে, বাল্মীকির মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি ব্যাধকে অভিশাপ দিলেন, কবিতার ভবিতব্য লিখে দিলেন ব্যাধের ললাটে— মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। ক্রৌঞ্চমিথুনের একতরের মৃত্যুতে যে আলোড়ন তৈরি হল, পক্ষীকুল-সমাকুল বনের মধ্যে বাল্মীকি যখন নিজের মধ্যেই নিজে আবিষ্ট হলেন, তখনই সেই অবাক অনুভূতি তৈরি হল তাঁর। শিষ্যকে বললেন— এ আমি কী বললাম, এটা তো কবিতা হয়ে গেছে— কিমিদং ব্যহৃতং ময়া— এক পক্ষিণীর শোকে আকুল আমার হৃদয় থেকে কবিতার জন্ম হয়েছে— শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।

আমরা বলবো— আদিকাব্যের প্রথম পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হল সেই বনের মধ্যে তমসার তীরে, যেখানে উন্মুক্ত আরণ্যপ্রকৃতির আনন্দ অনুভবের মধ্যে ঘটনার

বৈপরীত্য কবিচিত্তের আবরণ ভঙ্গ করে দিল, জন্ম দিল কবিতার— বাল্মীকি রামকথা লেখার সূত্র লাভ করলেন। সেটা আমার কাছে খুব লক্ষণীয় মনে হয়, সেটা হল— কাব্যারম্ভেই কবির মনোভূমির প্রেক্ষাপটে এই বনভূমি, তমসার টলটলে জলে বাল্মীকির মহাকাব্য বন-অরণ্যকে অন্যতর এক ভূমিকা দিয়েছে, যেখানে অরণ্য-প্রকৃতি বারবার ফিরে আসে মানুষের জীবনযাপনের অন্তরঙ্গ সহচারী হিসেবে। অথচ আমাদেরই অন্যতর মহাকাব্য যে মহাভারত, যা রামায়ণের বিপ্রতীপ পরিসরে অনেকাংশেই জটিল এবং আবর্তময়, সেখানে বন-অরণ্য খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং অবশ্যই সমাজনীতির তাৎপর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। আরও স্পষ্ট কথায়— রামায়ণের মধ্যে বন-অরণ্য তার আত্মস্বরূপে প্রাকৃতিক তাৎপর্যেই ধরা পড়ে, কিন্তু মহাভারতে বন-অরণ্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য এত বেশি, এতই তা মনুষ্য-জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, যাতে প্রকৃতির চাইতেও প্রাকৃত মানুষের সঙ্গে তার সংযুক্তিটাই মহাভারতে বড়ো হয়ে ওঠে।

বনে বাস করার গভীরতা যদি গভীর বনে বাস করার কোনো প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে থাকে, তবে আর সর্বোত্তম উদাহরণ পাওয়া যাবে রামায়ণে। পুত্রহীন দশরথ পুত্রার্থী হয়ে যে মুনির শরণ নিয়েছিলেন, তিনি হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি এমনই এক বীতরাগ মুনি, যিনি যুবক বয়স পর্যন্ত তাঁর বনবসতির বাইরে আসেননি। বাইরের কোনো স্ত্রী-পুরুষও তিনি দেখেননি কোনো দিন— স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগরাষ্ট্রমজম্। লৌকিক জগতে তাঁকে ধরে আনার জন্য রাজমন্ত্রীরা বারমুখ্যা গণিকাদের পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে বার করতে বারমুখ্যাদের প্রবেশ করতে হয়েছিল গহন বনে— বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশু র্মহৎ। তাঁকে প্রলোভিত করার জন্য বেশ্যারা শহরে তৈরি লাড্ডু খেতে দিয়েছিলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সেটাকে শহুরে ফল ভেবে খেয়েছিলেন। রামায়ণের কবি মন্তব্য করেছেন— বনে যারা নিত্য থাকেন, বনের বাইরে কোনোদিন আসেননি, এমন মানুষ তো ফল ভেবেই শহরের লাড্ডু খাবেন— অনাস্বাদিতপূর্বানি বনে নিত্যনিবাসিনাম্।

আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে-সব বনে মানুষেরাও থাকতেন, তাঁরা গভীর বনের প্রবেশমুখেই থাকতেন, গ্রাম থেকে সেটা অনেক দূরে বটে, কিন্তু বনের গহনে নয়। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি আমাদের ভাবনায় যেন প্রত্যুদাহরণ হিসেবে কাজ করেন, হয়তো বা তিনি প্রত্যুদাহরণই, কেন-না এমন নিত্যবনবাসী মুনির সঙ্গে রামায়ণ কিংবা মহাভারত কোথাওই আর আমাদের পরিচয় হয়নি। এই মুনির ব্রহ্মচর্য অথবা স্ত্রী-পুরুষের দর্শনানভিজ্ঞতায় তাঁর মানসিক স্থিরতা কোন জায়গায় পৌঁছেছিল, সেটা ফ্রয়েড সাহেবের 'ইনস্টিংক্ট' বা 'লিবিডো' দিয়ে মাপা যাবেনা। বাল্মীকি যেহেতু সূত্র দিয়েছিলেন— বারবনিতা বেশ্যারা ঋষ্যশৃঙ্ককে গাঢ় আলিঙ্গন করে শহরের লাড্ডু খেতে দিয়েছিল এবং সেগুলিকে তিনি ফল মনে করে খেয়েছিলেন। রামায়ণের কবির

এই সূত্র ধরে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক সংস্কৃত রামায়ণকার একটু আগ বাড়িয়ে লিখেছিলেন যে, তারা নাকি আলিঙ্গনের সময়ে নিজেদের উত্তমাঙ্গ উন্মোচন করে সুপুষ্ট স্তন-দর্শনও করিয়েছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে এবং বনবাসী মুনি অপরিচয়ের আহ্লাদে সেগুলিকে ফলই ভেবেছিলেন।

এতদ্দ্বারা আমরা প্রথমত বলতে চাই রামায়ণের বনচর্যা কিন্তু এইখান থেকেই আরম্ভ হয়। রামায়ণে নিত্যবনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গ প্রায় এক গহন বনে বাস করেন, যাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জনপদ এবং নগরের কোনো সম্পর্ক নেই। নগর এই বনের সম্পর্ক তৈরি করে, তাঁর বিয়ে দেয় অঙ্গদেশের নাগরিকা শান্তার সঙ্গে। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ অযোধ্যাপতি দশরথের বন্ধু। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে নিজের পালিতা কন্যা শান্তার বিয়ে দেবার পর থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ কিন্তু আর সেই গহন বনে ফিরে যাননি, তিনি শান্ত মনে শান্তার সঙ্গে অঙ্গদেশেই বসবাস করতে লাগলেন— এবং স ন্যবসত্তত্র... শান্তয়া সহ ভার্যায়া। ফ্রয়েড সাহেবের জয় হল, নগরবাসী বনবাসীর নাগরায়ণ ঘটাল। এতৎসত্ত্বেও বলবো— রামায়ণের বনের চরিত্র অনেক বেশি প্রাকৃতি, মহাভারেতর চাইতে তার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি, অনেক বেশি সে তার নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে। ফলে রামায়ণে যে-কোনো বনেই আমরা প্রবেশ করব, তাঁর অগ্রভাগ যদি ঋষিদের তপোবনও হয়, সেখানে বনের প্রাকৃতিক সরসতাই বেশি মনে আসবে। অন্যদিকে মহাভারতে বনের চরিত্রে অনেক বেশি রাজনীতিকরণ ঘটেছে। মহাভারতের বন-চরিত্রে মানুষের প্রাধান্য অনেক বেশি, মানুষ যেন এখানে অনেকটাই বনকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে।

এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, তমসার তীরে এক বনের মধ্যেই যেখানে বাল্মীকির কবিপ্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল, সেখানে মহাভারতের প্রথম পাঠ উচ্চারিত হয়েছে রাজসভায়। ব্যাস দ্বৈপায়ন কোন অবসরে কোন স্থানে বসে এই বিরাট গ্রন্থের পঠন-পাঠন-লেখন আরম্ভ করেছিলেন, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মহাভারতে নেই বটে, কিন্তু বহুজনের জন্য যেখানে মহাভারতের বর্তমান পাঠ শুরু হল, সেই স্থান কিন্তু সেই বহুবিখ্যাত নৈমিষারণ্য। এখনও সেই জায়গাটা আছে উত্তর ভারতে সীতাপুর জেলায়, এখনও এর অপভ্রষ্ট নাম নিমসর বা নিমখারবন। মহর্ষি শৌনক বারো বছর ধরে বিরাট এক যজ্ঞ করার প্রকল্প নিয়েছিলেন এই বনে। যজ্ঞের কারণে বহুতর মুনি-ঋষিরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া-এমনিতেও নৈমিষারণ্য মুনিদের আবাস হিসেবেই পরিচিত ছিল। এই নৈমিষারণ্যে রোমহর্ষণ সূতের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি যখন উপস্থিত হলেন, তখন নৈমিষ্যারণ্যবাসী ঋষিরা একযোগে উগ্রশ্রবা সৌতির কাছে ব্যাসকথিত মহাভারতের কাহিনি শুনতে চাইলেন। রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা পরম প্রশান্তিতে মহাভারত-কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং আমরা মনে করি সর্বসাধারণের জন্য

এই কাহিনির দ্বার মুক্ত হল সেই অরণ্য থেকেই।

দুই মহাকাব্যের কথামুখেই অরণ্যের একটা প্রারম্ভিক ভূমিকা থাকলেও অরণ্যের চরিত্র কিন্তু দুই মহাকাব্যে এক নয়. রামায়ণে বোধহয় বন অরণ্যের প্রথমতম চেহারাটা ফুটে ওঠে। বন মানেই যেন বহির্বনের মানুষের কাছে একটা ভয়-ত্রাসের ব্যাপার, বাঘ-ভাল্লুক, সিংহ-শ্বাপদ, ছাড়াও এই বন যেন মানুষের কাছে অগম্য, বন-অরণ্যের সার্বিক প্রকৃতি যেন মানুষের কাছে বিপ্রতীপ আশঙ্কা নিয়ে আসে। এই দিক থেকে দেখলে মহাভারত বন আমাদের মনে কোনো ত্রাস জাগায় না। হ্যাঁ, নগর-জনপদের গৃহজ সুখ সেখানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অরণ্য এখানে অনেক আপন, মানুষের অনেক কাছাকাছি এবং মানুষ যদি একটু 'বানজারা' বাউন্ডুলে প্রকৃতির হয়, তবে ইচ্ছে করেও মানুষ এখানে বনে যায়। আবার রামায়ণে অরণ্যের প্রকৃতি খানিকটা আদিম বলেই অরণ্যের প্রকৃতি এখানে অনেক মধুর, অনেক অবিকৃত এবং সেই কারণেই ভীষণরকমের উপভোগ্য এবং ততোধিক বর্ণনাযোগ্য বলেই রমণীয়।

খুব মোটা দাগে যদি কথা হয় তবে, বলবো— অরণ্য নিয়ে ভয় এবং অরণ্যের সৌন্দর্য যদি রামায়ণ-মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়, তবে মহাভারতে জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচিত্রতর জীবনবোধের কথা বলে অরণ্য। আদিকাব্য বলেই আমরা রামায়ণ দিয়েই শুরু করতে চাই অর্থাৎ শুরু করেত চাই সেই ভয় দিয়ে— গভীর শ্বাপদসংকুল অরণ্য দেখে যেটা প্রথম বিক্রিয়া হয় মানুষের, রামায়ণে ঋষি বিশ্বামিত্র যৌবনসন্ধিতে পৌঁছানো রামচন্দ্রকে প্রথম রাজধানী থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তারকা রাক্ষসীকে বধ করার জন্য। সরযু নদী পার হয়ে গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরে এগোতে এগোতে এক জায়গায় চমকিত হয়ে রামচন্দ্র বললেন— এ তো সাংঘাতিক একটা বন দেখছি চোখের সামনে। এই বনের মধ্যে তো ঢোকাই যাবে না বলে মনে হয়। চারিদিকে জনমানবহীন, শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি— অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম। বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর আবাস এই বনে পাখিদের আওয়াজও কেমন ভয়ঙ্কর। বড়ো বড়ো সব গাছ— ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জুন, পাটলী, বদরী, তিন্দুক, বিল্ব ইত্যাদি জুড়ে রয়েছে এই বনটাকে। এইখানে এমন একটা বন তৈরি হল কী করে— কিন্বিদং দারুণং বনম্।

বিশ্বামিত্র যা বললেন, তাতে বোঝা যায় যে, এই জায়গাটা আগে বন-অরণ্য কিছু ছিল না, কিন্তু মানুষজন না থাকতে-থাকতে জায়গাটা বনে পরিণত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে এ-রকম জায়গা আমরা অনেক দেখেছি। বিশ্বামিত্র বলেছেন— জায়গাটার নাম আগে ছিল করূষ এবং মলদ। বর্তমানে করূষ এবং মলদ— দুটি জায়গাই বিহারের শাহাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয় এবং পণ্ডিতদের মতে বর্তমান বক্সারেই বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল, যেটি রক্ষার জন্য তাড়কা-বধের প্রয়োজন হচ্ছে। বিশ্বামিত্র

জানিয়েছেন— করূষ এবং মলদ রাজ্য আগে সুন্দর দুটি নগর ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে তাড়কা এবং তার ছেলে মারীচ এসে এই জায়গার দখল নিয়েছে, সেদিন থেকেই তাদের অত্যাচারে এই জনপদ শূন্য জনমানবহীন হয়ে পড়েছে। এখন তো সেখানে বিশাল বন। এই বনের মধ্যে তাড়কার বসবাস-হেতু এখন করূষ-মলদের নামই হয়ে গেছে তাড়কার বন— অতএব চ গণ্ডব্যং তাড়কায়াঃ বনং যতঃ। এখানকার দিনে যেমন গুণ্ডা-বদমাশের নাম নিয়ে জায়গার নাম চিহ্নিত করা হয় অথবা এক জায়াগয় একজন দুষ্ট লোকের প্রতিপত্তি হেতু জায়গার নামের সঙ্গে গুণ্ডার নাম জড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনই মহাকাব্যের কালে তাড়কার বন, হিড়িম্বের বন, বক রাক্ষসের বন এইরকম।

তাড়কার বন ছাড়িয়ে বিশ্বামিত্রের আশ্রম-বসতি, যার নাম সিদ্ধাশ্রম। মুনি-ঋষিরা এখানে যজ্ঞ-যাগ আরম্ভ করলেই এই রাক্ষসরা এসে পশুমাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিত অথবা ক্লেদ-রক্ত-নাড়ি-ভুঁড়ি। যজ্ঞভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্যই বিশ্বামিত্রের প্রয়োজন হয়েছে ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে দিয়ে তাড়কা বধ করানোর। আমরা আগেই বলেছিলাম— মুনি-ঋষিরা যে-সব অরণ্যভূমিতে থাকতেন, সেগুলি খুব গভীর বন নয়, গ্রামের প্রান্তসীমা শেষ হলে অগভীর বনের মধ্যে মুনি-ঋষিরা আশ্রম তৈরি করতেন, কিন্তু গভীর বন জন-মানবহীন অথচ লুকিয়ে থাকার সবচেয়ে ভালো জায়গা বলেই রাক্ষসেরা, যারা যেমন পরিশীলিত মানবগোষ্ঠীর মানুষ নন, তারা আর্য জনগোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন— এটা রামায়ণ-মহাভারত দুই মহাকাব্যেরই একটা বৈশিষ্ট্য। রাক্ষসদের আমরা আর্যেতর গোষ্ঠীর মানুষ বলবো কিনা, কিংবা তাঁদের মধ্যে 'ক্যানিবালইজম্' ছিল কিনা, সে তর্কে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এটা বলতেই পারি যে, যাদের মধ্যে সামাজিক পরিশীলন ছিল না, ন্যায় অন্যায়ের রুচিবোধ ছিল না, খাদ্যাখাদ্যের পার্থক্যবোধ ছিলনা, এমন সব মানুষেরা গভীর বনে বসতি করতেন অনেকেই এবং জীবনধারণের জন্য লোকালয়বাসীদের উৎপীড়ন করাটা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ত। রামায়ণের তাড়কা-বনের প্রান্তভাগে সিদ্ধাশ্রমের ওপর যে জুলুম চালচ্ছিল, মহাভারতের বক-রাক্ষসের অত্যাচারও সেখানে লোকালয় পর্যন্ত পৌঁছেছে। বক-রাক্ষস একচক্রা-গ্রামের অধিবাসীদের ফতোয়া দিয়েছিল— প্রত্যেকদিন একটি করে মানুষ তার আহার হিসেবে চাই।

বনের মধ্যে বসতি স্থাপন করে নিকটস্থিত মুনিঋষিদের আশ্রম তপোবন বা জনপদবাসীদের ওপর এই যে অত্যাচার— এটা মহাকাব্যিক বনচরিত্রের একটা অদিম রূপ বলে আমরা মনে করি, কিন্তু ঘন-গভীর এই সব বনের পরপরই যে অপেক্ষাকৃত কম গভীর অথচ প্রায় সমগভীর বনে যে মুনি-ঋষি-বানপ্রস্থীরাও বসবাস করতেন তার প্রমাণ আছে রামায়ণেই। তাড়কা-রাক্ষসীকে মেরে তাড়কার বন থেকে যেই

বেরোলেন রামচন্দ্র, অমনই তিনি বলছেন— পর্বতের সন্নিহিত এই স্থান এতটাই নিবিড় তরুরাজি-সমাকুল, যে এখান থেকে সেটা মেঘমালার মতো লাগছে, এই জায়গাটা মৃগ-পক্ষী সমাকুল এবং ভীষণ ভীষণ সুন্দর। মনে হচ্ছে, আমরা এখন গায়ে-কাঁটা দেওয়া সেই ভয়ঙ্কর বনটা থেকে বেরিয়ে এসেছি— নিঃসৃতাঃ স্ম মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তরাদ রোমহর্ষণাৎ।

মহাকবির মুখ দিয়ে তাঁর সত্তার অজ্ঞাতেই একান্তভাবে এক সঠিক শব্দ বেরিয়ে আসে। এই যে কান্তা কথাটা— এটা শুনতে যতই কান্ত লাগুক, প্রাচীন কোষকারেরা জানিয়েছেন যে, কান্তার তাকেই বলে যেখানে নাকি চোর-ডাকাতের ভয় এবং চলার পথে গাছগাছালির কাঁটাও এত যে সাধারণ মানুষ এখানে পথ বেয়ে চলতে পারে না। বিশেষত কোনো বিপদ ঘটলে এখানে কেউ বাঁচাতেও আসবে না---- চৌর-কণ্টকাদিভি-দুর্গমঃ পন্থাঃ কাংশ্চিন্ন তারয়তীতি কান্তারঃ। বিশ্বামিত্র যে-পথ দিয়েই রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এসে থাকুন, এই তাড়কার বনে চোর-ডাকাতের বদলে তাড়কা আছে, আছে তার দুই ছেলে সুবাহু এবং মারীচ। তারা এই বনভূমিকে অন্যের দুর্গম করে দিয়েছে।

বস্তুত বনের যে ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ আছে সেটা রামায়ণ খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছে এবং হয়তো সেটা জানানোর মতো বিষয়ও উপস্থিত হয়েছে। আমরা যে পূর্বে 'কান্তার' কথাটা উল্লেখ করলাম এবং রামচন্দ্র যে 'রোমহর্ষণ কান্তার' থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছাড়লেন, সেই কান্তার অবশ্য কোনো গহন বন এবং এই অর্থেই কান্তার কথাটা চালু ছিল রামায়ণের কালে, সেটা খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে রামচন্দ্রের কথায়। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাবার কথা বলতেই সীতাও তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য নিজের যুক্তি প্রকাশ করলেন। এই অবস্থায় রামচন্দ্র বন বলতে যে শব্দটা প্রথম উচ্চারণ করলেন, সেটা হল 'কান্তার' এবং এককথায় বন বলতে যে শব্দটা প্রথম উচ্চারণ করলেন, সেটা হল 'কান্তার' এবং এককথায় বুঝিয়ে বললেন— সাধারণভাবে এটাকে বন বলছি বটে, কিন্তু এ হল কান্তার, যার সবটাই দোষে ভরা— বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে। তুমি এই বনবাসের বুদ্ধি ত্যাগ করো সীতা। সত্যি বলতে কী, সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য বনবাসের সমস্যাগুলি রামচন্দ্র বাড়িয়ে বলছেন কিনা, সেটা না ভেবেও বলতে পারি বনের এই ভয়ঙ্করী রুদ্রা প্রকৃতিও বড়ো সত্য। রামচন্দ্র বলেছেন— বন-ব্যাপারটা কোনো কালেই সুখের নয়, বরঞ্চ সেটা দুঃখেরই চিরকাল— সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্। এখানে সাধারণ কথা হিসেবে বন-শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে বটে, কিন্তু বন বলতে যে লতা-গুল্ম-বৃক্ষে ভরা বিশাল জঙ্গল বোঝায়— যেখানে খানিকটা কষ্টসাধ্য হলেও গতায়াত করা যায়— এমন একটা 'সাব-ফরেস্ট' এটা নয়, এটা আসলে এমনই এক গহন বন, যেখানে হিংস্র

জন্তুর বসবাস, এখানে গিরিকন্দরে থাকা সিংহের নিনাদ মিশ্রিত হয় গিরি নির্ঝরের সঙ্গে। আর শুধু সিংহ নয়, অন্যান্য বন পশুও এখানে এতটাই ভয়ঙ্কর যে, মানুষ দেখলেই তারা খেতে আসে। নদীতে নামলেও এখানে বড়ো বিপদ। সেখানে কুমিরের ভয়, মাতা হাতিও এখানে নদী পার হয়না। লতা-কাঁটায় আকুল বনের মধ্যে নানারকম পশুর আওয়াজ, অনেক খুঁজেও কোনো জলাশয় পাওয়া যায় না, এখানে পথ পেলেও হেঁটে চলা বড়ো কঠিন— নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্।

এখানে যেভাবে বন-গহনের বর্ণনা চলছে তার মধ্যে যেন আমাদের চিরকালীন অরণ্য-ভাবনার একটা ভয়জ চিত্র আছে— বাঘ-সিংহ-কুমির সবাই খেতে আসছে, পথ নেই, জল নেই, নিজে কিছু করারও উপায় নেই এখানে। গাছের ডাল কেটে একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে নেবারও উপায় নেই এখানে। রাত্রে শুতে হলে স্বয়ংপতিত পর্ণের শয্যায় শুয়ে থাকতে হবে— সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ংভগ্নাসু ভূতলে। শুধু তাই নয়, ঘন অন্ধকার, সাপ-খোপ, ডাঁশ-মশা, পোকা-মাকড়-বিছে, কোনা কিছুর অভাব নেই এখানে— পতঙ্গা বৃশ্চিকা কীট দংশাংশ্চ মশকৈঃ সহ। সত্যি বলতে কী, এটা সেই কাল্পনিক বন— যেখানে বাঘ-সিংহের সঙ্গে ডাঁশ-মশার কামড়ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার বোঝা যায় বিভিন্ন বনস্থলীর যে স্বতোবিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা এখানে অনুপস্থিত। রামচন্দ্র সামগ্রিক এক বনচিত্র তৈরি করেছেন, যেখানে সীতাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না বলেই, অথবা সীতাকে সেখানে নিয়ে যেতে চান না বলেই বনবাসের সমস্ত ভয়ঙ্কর সমস্যাগুলি একত্র সমাবিষ্ট করে বনের এক ভয়াল চিত্র তুলে ধরছেন রামচন্দ্র— বনন্তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা/বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।

তবে কিনা আমাদের সাধারণ মনোলোকে এই ভয়াল ছবিটাই স্বাভাবিক এবং তার সবচেয়ে বড়ো কারণ বোধহয় নির্জনতা, মানুষের সঞ্চার, নেই এখানে, আর এই স্ব-সম মানুষের অভাবই বনকে ভয়াল করে তোলে।

বনকে এমন ভয়ানক চিত্রে বর্ণনা করলেও রামায়ণের এই অরণ্য মানুষের কাছে অগম্য নয় এবং সব অরণ্য একরকম নয়ও। পণ্ডিতজনেরা শাব্দিক দৃষ্টিতে বন আর অরণ্যকে একটু পৃথক করে দেখবার চেষ্টা করেছেন, কেন-না আমরা মুনিদের বনবাসী দেখেছি এবং গার্হস্থ্য আশ্রমের শেষে বনে চলে-যাওয়া বানপ্রস্থী মানুষেদেরও দেখেছি। হয়তো এইভাবে থাকা যায় বলেই পণ্ডিতেরা বন বলতে ভেবেছেন গাছগাছালিতে ভরতি হলেও সে-সব গাছে ফল পাওয়া যায় সুস্বাদু, এবং ভূমির প্রকৃতিও এখানে তেমন উচ্চাবচ নয়, অর্থাৎ এটাকে সাব-ফরেস্টেশন-এর চিহ্নে বেঁধে ফেলা যায়। তবে আমাদের কেবলই মনে হয়— এই পণ্ডিতেরা 'সাব-ফরেস্টশন-এর ইংরেজি সংজ্ঞা আগে বুঝে নিয়ে তবে বনের সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। বস্তুত রামায়ণ-মহাভারতের শব্দ প্রমাণে বন-শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে এবং তার বাস্তব

প্রয়োগের মধ্যেও সব সময় কোনো রকম ভাব দেখিনি, যা অরণ্যের চেয়ে আলাদা। আর শব্দতঃ অরণ্যের মধ্যেই ভূমিগত বৈচিত্র্য থাকবে, জৈব-বৈচিত্র্য থাকবে, উদ্ভিদ-জীবনের বৈচিত্র্য থাকবে, বন্যতার বৈচিত্র্য থাকবে, আর বনের মধ্যে সেগুলি থাকবে না, সেটা রামায়ণ-মহাভারতের প্রমাণে বলা যাবে না। এখানে বন-অরণ্যের সংজ্ঞা প্রায় একাকার হয়ে গেছে, আর আভিধানিক অর্থেও অমরকোষে— অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, বন— এগুলি পর্যায় শব্দ। দুর্গমতা এবং মনুষ্যাধিকারের বাইরে যে-সব বনকে অরণ্য বলতে চাইছেন পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভাষায় সেটাকে মহারণ্য, অরণ্যানী অথবা কান্তার শব্দে সেগুলিকে অভিহিত করা উচিত।

বনের যে ভয়ানক রূপ রামচন্দ্র বর্ণনা করলেন, সেই বর্ণনা না শুনেও তো সীতা আগেই রামচন্দ্রের সঙ্গে সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। তার কারণ, বনের রূপকল্পে যদি এই ভয়াল-ভয়ানক চেহারাটা থাকে, তবে সেই রূপকল্পনার মধুরতাও আছে অনেক। রামচন্দ্র বনে না গিয়েও যেন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের ভয়াবহতা নির্ণয় করেছেন, অবশ্য তারকা-রাক্ষসীর বনটা তাঁর দেখা ছিল, তবে রামচন্দ্র যেভাবে এই বনের বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে একটা রূপ-কল্পনা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই রূপকল্পের ভাবনায় বনবাসের ভয়ের অংশটা তিনি রামচন্দ্রের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন— তুমি সবাইকে যেন দেখে রাখো, তেমনই আমাকেও দেখে রাখবে। কিন্তু বনে আমি যাবই। মানুষের চলাচলশূন্য সেই দূর্গম বনে নানা জীব-জন্তুর সঙ্গে বাঘ-সিংহও আছে, তারা থাকুক, তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব, অহং দূর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্। না হয় ফল-মূল খেয়েই কাটিয়ে দেব বনে, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবই। আমার ইচ্ছে করে— আমি তোমার সঙ্গে বনের নদী-পাহাড় দেখব। দেখব কত জলস্থান, জলসিক্ত ভূমি— ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ। বনের মধ্যে হংস-কারণ্ডবের সমাকুল ধ্বনি শুনব, দেখব সরোবরে ফোটা সহস্রদল পদ্মফুল। সুযোগ আসলে এবং তোমার মত থাকলে সেই সব সরোবরে স্নান করব মাঝেমাঝে। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে বীর আমার! আমি তোমার সঙ্গে সব দেখতে চাই— ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা।

সীতার এই ইচ্ছা থেকে প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষে বন-অরণ্য স সময়েই ভয়াল রুদ্ররূপে আসেনি, এসেছে মধুর সহায়তা নিয়ে, মধুর মোহময়তায়। ভয় ভয়ানকের বিপরীতে বনের প্রতি এই আসঙ্গের দৃষ্টিপাত লক্ষ করেই এক গবেষক বন্য-প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে আমাদের পরম্পরাগত রসতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। অরণ্যের ভয়াল ভাবনার মধ্যে যদি রৌদ্ররসের রূপ দেখতে পাওয়া যায় তো সেখানে বীভৎস-ভয়ানক রসেরও উপাদান আছে, যদিও ভয়ানক এবং বীভৎসের উদাহরণ হিসেবে রামায়ণ থেকে যেভাবে তিনি বিরাধ রাক্ষরে বর্ণনা করেছেন সেটা অরণ্যের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু নয়। তা ছাড়া বিরাধ রাক্ষসের বর্ণনাতেও অলীক কবিকল্পনা আছে, যা অন্যান্য সাধারণ রাক্ষসদের সঙ্গে মেলে না. বিরধ যেহেতু অভিশাপ-গ্রস্থ গন্ধর্ব তুম্বুরা, তাই বিরোধের বর্ণনাতে অভিশাপের বিকারাতিশয্য আছে, কন্তু ্যসেই বীভৎসতা এবং ভয়ানকতা বনারণ্যের কোনো ওতপ্রোত বৈশিষ্ট্য নয়। কাজেই গবেষকের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত এখানে বড়োই চেষ্টাকৃত মনে হয়. বরঞ্চ সেই তুলনায় রৌদ্র, শৃঙ্গার অথবা শান্ত রসের উপযোগ-ঘটনা এই গবেষের উদ্ভবনী চেষ্টাকে খানিকটা সার্থক করে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, বন-অরণ্য, বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী এবং অনেক সময় পশু-পক্ষীও বিশেষ বিশেষ রসসহায় উদ্দীপন হিসেবে কাজ করে। রসশাস্ত্রের নিরিখও সেটাই। বনারণ্য নিজে কখনই রসতত্ত্বের আলম্বন হয়ে ওঠে না, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কেই তা রস-বিস্তারের সহায়, আত্যন্তিক সহায়।

তবে হ্যাঁ, বন-অরণ্যের কথায় সীতার যে স্বপ্ন-শব্দ উচ্চারিত হয়েছে— আমি তোমার সঙ্গে নদী-পাহাড় দেখব, হংস-কারণ্ডবের ধ্বনি শুনব— এই স্বপ্নসন্ধানের নিরিখে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, রামায়ণ এবং মহাভারতে প্রধান যে দুটি রস এবং স্থায়ীভাব আছে— শৃঙ্গার এবং শান্ত— সেই দুটি রসেরই আধার এই দুই মহাকাব্যের বন-অরণ্যানী। যদিও রামায়ণের যত জায়গায় শৃঙ্গারের প্রধানতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বন, মহাভারতে বন ঠিক ততটাই শান্ত সরস বৈরাগ্যের আধার এবং একই সঙ্গে বনের সঙ্গে রাজা-রাজনীতির সংযোগ মহাভারতে ততটাই প্রকট, রামায়ণে যতটা তা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিস্তারে। এর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই দুই মহাকাব্যের ভেতরে ন্যূনধিকভাবে পারস্পরিক সমাশ্রয়ে অনুসৃত— অর্থাৎ রামায়ণে বনবিষয়ক শান্ত-বৈরাগ্যের কথা নেই বা মহাভারতে কন্যাশ্রয়ী শৃঙ্গারের কথা পাওয়াই যাবে না, এমনটি বলতে চাই না, কিন্তু প্রাধান্য অনুসারেই তো আমরা এক-একটা 'ট্রেইট' তৈরি করি, সেই কারণেই শৃঙ্গার এবং শান্তকে আমরা প্রধান-ব্যাপদেশে রামায়ণ এবং মহাভারতের অন্যতম রসাশ্রয় বলে চিহ্নিত করেছি।

যে মহাকবি বলেছিলেন— যৌবনং বা বনং বা— তিনি শুধু বন-শব্দটাকে প্রায় সম-সংখ্যাত একটি শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করে অনুপ্রাসের চমক দেখাতে চাননি, তিনি শৃঙ্গার ও বৈরাগ্যের স্থানটাকে আলাদা করে দিয়েছিলেন— যেন বনারণ্যে শৃঙ্গারের কোনো স্থান নেই, সেখানে যৌবনোচিত কোনো উপভোগ-বিলাসের ভাবনা যেন ভাবাই যায় না। সে যেন চিহ্নিত বৈরাগ্যের জায়গা, সবাই সেখানে গেলেই যেন ঋষি-মুনির ব্রতে দীক্ষিত হয়। অবশ্য এই মহাকবির আক্ষেপটা অন্য জায়গায়। তাঁর ইঙ্গিত হল— সংসারের জগতে যদি থাকি, তবে অশেষ রমণী-কুলের শরীর-সাহচর্যে যৌবনটাকেই উপভোগ করবো, আর সেটা না জুটলে বনে গিয়ে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করাই ভালো— যৌবনং বা বনং বা। আমাদের মহাকাব্য দুটি এই চরম অবস্থানের মধ্যে নেই। সেখানে বন যেমন মুনিবৃত্তির জায়গা, তেমনই এই যৌবন-উপভোগেরও

এক প্রকৃষ্ট ভূমি বটে— হয়তো এটা বুঝেই বাংলার মহাকবি লিখেছিলেন—

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে,
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ,
যৌবনেতেই ভালো চলে।

বন্য প্রকৃতির একটা 'সাসটেইনড' প্রাকৃতিক বর্ণনা, যা আমরা রামায়ণে খুব ভালোভাবে পাই, মহাভারতে তেমনটা আমরা পাই না। হয়তো ঘটনার বাহুল্য এবং প্রতিপদের রাজনৈতিক জটিলতা মহাভারতের মহাকবিকে কিছুতেই শান্ত থাকতে দেয়নি, ফলে বন-অরণ্যের প্রাকৃতিক মাধুর্য সেখানে মনুষ্যজীবনের ক্ষণিক অন্তরালের মাঝে এসে জুড়ে বসেছে, কিন্তু রামায়ণে বন্য প্রকৃতি একেবারে এককভাবে বর্ণনীয় হয়ে ওঠে। স্বয়ংস্ফূট এই প্রকৃতির সঙ্গে যেন মানুষের সম্পর্ক রচিত হয়, মানুষের মনের ভাব সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একত্তর হয়ে ওঠে— বনের পশু-পাখি, লতা-বৃক্ষ, বন্য সমাজের সদস্য হিসেবে বনবাসী মানুষের কাছাকাছি চলে আসে। প্রতিতুলনায় মহাভারতের নাগরিক-বৃত্তিসম্পন্ন রাজাদের কাছে বন যেন রাজবৃত্তের অঙ্গ, বন সেখানে প্রসঙ্গত উদয় হয় কখনও 'রিলিফ' হিসেবে, কখনও বা রাজনীতির প্রয়োজনে।

সেই যে বিখ্যাত 'মৃগয়া' শব্দটা— রাজারা দূর্গ-রাজধানী ছেড়ে বনে ঢুকছেন পশু-শিকারের জন্য, এটা যতটা বিনোদন, তার চেয়ে বেশি কিন্তু নেশা— যেটাকে কামজ ব্যসন বলে চিহ্নিত করেছেন ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিতেরা। মৃগয়া করার জন্য রাজা বনে গেছেন, বনে গিয়ে পশু শিকার করছেন— এই চিত্র তো প্রাচীন সাহিত্যে ভূরি ভূরি, এমনকি তা মুঘল আমল পর্যন্ত প্রসারিত। সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁর প্রথম বারো বছরের রাজত্বেই নাকি সতেরো হাজার বন্য পশু শিকার করেছিলেন এবং তার মধ্যে নীলগাই আর হরিণ ছাড়াও বাঘ-সিংহও যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য রাজাদের এই মৃগয়া-ব্যসনে বনে যাওয়াটা অনেক সময়েই শৃঙ্গার-মাধুর্যে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ বনের মধ্যে পশুহিংসার চিত্র মুহূর্তের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা অথবা যৌনতার পটভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মহাভারতের মহারাজা দুষ্মন্তের কথা খেয়াল করুন একবার। ইনি কিন্তু কবি-কালিদাসের দুষ্যন্ত নন যে, প্রাথমিকভাবে কালিদাসের দুষ্মন্তের অতিমৃদুল এক মৃগয়া-নাট্য খুব তাড়াতাড়ি এক সুন্দরী রমণীর হৃদয়-মৃগয়ায় পরিণত হবে। মৃগয়া-যাত্রার মধ্যে একটা বিরাট সৈন্য-বাহিনীও ছিল এবং তাঁর মৃগয়ার মধ্যে— এই হরিণ দেখা যাচ্ছে, এই বন্য বরাহ ছুটে যাচ্ছে, ধর-ধর মার-মার— এই ইতস্তত বন থেকে বনান্তরে যাওয়া— এই হিংসাশ্রয়ী মৃগয়া-চিত্র যতখানি হিংসার কথা বলেছে, তার চেয়ে বেশি বলেছে তাঁর পৌরুষ এবং অস্ত্রক্ষমতার কথা, কারণ তাঁকে ভবিষ্যতে শকুন্তলার বীর নায়ক করে তুলতে হবে। মহাভারতের সে দায় নেই। এখানে বনটাকে এক সমগ্র ভাবনায় বোঝা যায়। রাজা এখানে মৃগয়ায় যাচ্ছেন চতুরঙ্গ

বাহিনী নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্রের শেষ নেই এবং সেনাবাহিনীর পদশব্দ এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি এখানে এতটাই যে, মনে হয়, রাজা যেন যুদ্ধে যাচ্ছেন। যেভাবে রাজা পশুহিংসার জন্য বনে প্রবেশ করছেন, তাতে মুহূর্তের মধ্যে অরণ্যের নান্দনিক প্রকৃতি যে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলছে, মহাভারত কবিজনোচিত বেদনায় সেটা বুঝিয়ে দেয়। রাজা দুষ্মন্ত প্রথম যখন বনে প্রবেশ করছেন, মহাকবি তখন বলেন— পথ চলতে চলতে স্বর্গের নন্দন-বনের মতো এক বন দেখতে পেলেন— স গচ্ছন্ দদৃশে ধীমান্ নন্দন-প্রতিমং বনম্। অনামা বড়ো বড়ো গাছের সঙ্গে বেলগাছ, খাদির, অর্ক, ধর, কৎবেলের মতো গাছও আছে। অরণ্যের ভূমি সমতল নয়। পাহাড়ের ওপর ঠিকরে-পড়া রোদ্দুর গাছের ফাঁক দিয়ে বনের মধ্যে ঢোকে, পাহাড়ে পাথর ভেঙে গড়িয়ে অরণ্যভূমিকে বিষম করে তুলেছে। ধারে কাছে কোথাও জল নেই, মানুষের দেখা মেলে না কোথাও এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে এই বন— নির্জনং নির্মনুষ্যঞ্চ বহুযোজনমায়তম্। এই বনে বাঘ-সিংহ অনেক, হরিণ, হাতি, এবং বনের পাখিও প্রচুর। আর এই বাঘ-সিংহ সঙ্গে নিয়েই থাকে কিছু বনচর আদিবাসী মানুষ— মৃগসিংহৌর্বৃতং ঘোরৈরন্যৈশ্চাপি বনেচরৈঃ। নগর-জনপদের মানুষের সঙ্গে এঁদের যেন কোনো সম্পর্কই নেই বরঞ্চ বন্য পশুর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক অনেক বেশি। নগর-জনপদবাসীর সঙ্গে এই সব মানুষের প্রকৃতি মেলে না বলেই হয়তো মহাভারতের কবি তাঁর প্রাথমিক বর্ণনায় বনটাকে বলেছেন— নির্জনং নির্মনুষ্যঞ্চ— এমন জায়গা যেখানে জন-মানুষ দেখা যায় না কোনো।

কিন্তু আমাদের মনে হয়— যেখানেই এক মহাবনের কথা এসেছে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে যে বনের আয়তন, সেখানেই এই বর্ণনা— খাবার নেই, জল নেই, মানুষ নেই, কিন্তু বন্য পশু বেশি, বাঘ-সিংহ বেশি— এমন বর্ণনা। খেয়াল করে দেখুন, পাণ্ডবরা যখন জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে বিদূরের নির্দিষ্ট সুরঙ্গ-পথে বেরিয়ে গেলেন, তখন গঙ্গা পার হবার পর একের পর এক বন পেরিয়ে গেছেন। শেষপর্যন্ত এমন একটা বনে এসে তাঁরা পৌঁছেছেন যেখানে বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজির পত্ররন্ধ্র ভেদ করে সূর্যের কিরণ পর্যন্ত পৌঁছোয় না তৃণাকীর্ণ ভূমিতে, চার দিকটাই যেন এই বনে অন্ধকার লাগে, অথচ এখানে হাওয়া বয় এমন শন্-শন্ করে যেন সব ভেঙে পড়বে— অপ্রকাশা দিশঃ সর্বা বাতৈরাসন্ননার্তবৈঃ। এটা এমন বন যেখানে ফল-মূল পাওয়া যায় না, জল কোথায় তার ঠাহর নেই কোনো, অথচ বন্য পশুপক্ষীর উপস্থিতি খুব টের পাওয়া যাচ্ছে— ক্রূরপক্ষি-মৃগং ঘোরম্... অল্পমূলফলোদকম্। গাছের পাতা উড়ে পড়ছে মাথায়, প্রবল বাতাসে এখানে-সেখানে গাছের ডালও ভেঙে পলছে। পাণ্ডবরা এই বনে এসে পৌঁছেছেন প্রায় সন্ধ্যাকালে, ফলে বন্য ভয়াবহতায় মনোরমা সন্ধাও ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে— ঘোরা সমভবৎ সন্ধ্যা দারুণা মৃগপক্ষিণঃ। এই রকম একটা বনের মধ্যে পএবশ করলে অদ্ভুত যে ভয় তৈরি হয়, তার একটা

স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন মহাভারতের কবি। এই বনের মধ্যে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায় অধীর পাণ্ডবেরা শুধুই চিন্তা করছিলেন— এ কোতঅয় এসে পড়লাম আমরা, নক্ষত্রসূচিত পথে যেতে-যেতেও আমরা পথ হারিয়ে ফেলছি বারবার, কী করবো, একমন করে এই মহাবন থেকে বেরোবো ভেবে পাচ্ছি না মোটে— দিশশ্চ ন বিজানিমো গন্তুঞ্চৈব ন শক্নুমঃ।

মহাবনের এই মহাভয়ের আবহ মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু শৃঙ্গার রসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই বনেই হিড়িম্ব রাক্ষসের সঙ্গে দেখা হবে ভীমের, তাতে প্রাথমিকভাবে ভয় আরও একটু বাড়বে, কিন্তু তারপরেই রাক্ষসী হিড়িম্বা আসবেন। পাণ্ডব মধ্যম ভীমকে দেখে তিনি মোহিত হবেন। রাক্ষসী চেহারা ঘষে-মেজে তিনি এমনই রূপবতী হয়ে উঠবেন যে, তাঁর দাদা হিড়িম্ব পর্যন্ত ক্রোধে তেতে উঠবে। সে দেখবে— হিড়িম্বা ভীমকে ভোলানোর জন্য খোপায় ফুল গুঁজেছে; চুল বেঁধে, কাজল পরে, নখ কেটে, চর্ম মসৃণ-কোমল করে নিজেক সে বড়ো মোহনা রূপে সাজিয়ে তুলেছে। তার পরিধানে স্ফুটাস্ফুট সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং অলংকার। এত সব সজ্জার উপকরণ এই গহন বনে মধ্যে কোথা থেকে জটে,সে-কথা মহাকবি বলেননি, কিন্তু মনুষ্য-সম্পর্কহীন এই বনের মধ্যে ভীমের মতো এক অসম্ভব পুরুষালি শরীর যে হিড়িম্বার মনের মধ্যে পৌরুষেয়ী সঙ্গমেচ্ছা জাগিয়ে তুলেছে, সেটা তার দাদা হিড়িম্বের মনে এক শঙ্কার কারণ ঘটে, ক্রোধেরও কারণ বটে— পুংস্কাম শঙ্কমানশ্চ চুক্রোধ পুরুষাদকঃ।

হিড়িম্ববধের পর হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের মিলন হল, কিন্তু রাক্ষসী এক জায়গায় ঘর বেঁধে ভীমের সঙ্গে সংসার পাতল না। তার সময় কম, পুত্রর জন্ম পর্যন্ত সে ভীমের সঙ্গে থাকতে পারবে এবং তাও শুধু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। অতএব রাক্ষসী সময় নষ্ট না করে ভীমের সঙ্গে প্রতিদনি যে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল সেগুলিও কিন্তু দূর্গম বন, পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত পার্বত্য এবং সমতলভূমি— তথৈব বনদুর্গেষু পর্বতদ্রুম মানুষু। আরও অনেক দেবারণ্য, বন, উপবন, পর্বতগুহা, নদী-দ্বীপ-প্রদেশ হিড়িম্বার বিচরণ পর্যটন-পরিক্রমার মধ্যে আছে, তবে তার বেশি সময়টা যদি হিমালয়ের কুঞ্জবনে গিরি-দরী-গুহায় কেটে গিয়ে থাকে— হিমবদ গিরিকুঞ্জেষু গুহাসু বিধিবাসু চ— তাহলে হিমালয়-প্রদেশের মানালিতে হিড়িম্বার যে থান এখনও আছে, সেটা প্রাচীন অরণ্যভূমির শৃঙ্গার উদ্দীপনের সত্যটুকু যথাযথভাবে প্রকাশ করে।

হিংসার জায়গা থেকে শৃঙ্গারের পটভূমি তৈরি হয়ে-যাওয়া এই যে অরণ্য, এই অরণ্য আমাদের আজকের নাগরিক বৃত্তিতে অচেনা লাগলেও সে-কালের আবহে এই রূপান্তর একেবারেই অস্বাভাবিক নয়, কেন-না সেকালের অরণ্য এবং আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে তার বীজ ছিল। শুধু বাঁচার জন্য, ক্ষুদার গ্রাস সংগ্রহ করার জন্য যে-মানুষ পশু-শিকার করে বেড়াত, তার সঙ্গে মহাভারত-রামায়ণের সুসভ্য মানুষের

কালের তফাত অনেক, কিন্তু শিকার করার যে সাংস্কারিক অভ্যাস, তার সঙ্গে রাজকীয় তথা নাগরিক জীবনের যোগাযোগ ঘটল দুটি কারণে এবং সেটা কালিদাসের মতে মহাকবিও সঠিক ধরেছেন। এমনিতে 'মৃগ'-ধাতুর মধ্যে অন্বেষণের একটা অর্থ প্রাথমিক বৃত্তিতেই ধরা আছে— 'মৃগ' মানেও প্রাথমিক অর্থে পশু, যাকে অন্বেষণ করে ধরতে হয়। এই অন্বেষণার বৃত্তিটাই আদিম জনজাতির সংস্কার, যেটা নাগরিক সভ্যতার সময়ে রাজাদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সেটা তাঁদের বিলাস-ব্যাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল এই জন্যেই যে, ভবিষ্যতে যিনি শত্রুহন্তা বীর হয়ে উঠবেন, তাঁর ধনুক-বাণ অভ্যাস করার সবচেয়ে উপযুক্ত আধার ছিল চলমান পশুপাখি। বন্য যে পশুগুলি চরে বেড়ায়, মানুষের অস্ত্র থেকে বাঁচবার জন্য যে দৌড়োয়, বনের বৃক্ষ-লতা-গুল্মের আবরণও যাদের রক্ষা করতে পারে না, সেই চলমান পশুদের লক্ষ করে তির বিঁধিয়ে দেওয়াটাই যে পশুশিকারের একটা বড়ো উদ্দেশ্য, এ-কথা কালিদাসের মতো মহাকবিও তাঁর নাটকের মধ্যে প্রসঙ্গ টেনে এনে বলে গেছেন— উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে। ফলত যেটা হয়েছে, বন-অরণ্য অনেক সময়েই রাজা-রাজড়া এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের হিংসার জায়গা হয়ে উঠেছিল। আমরা ঠিক এটাই দেখেছি মহাভারতে, যখন মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে এক বহু-বিস্তীর্ণ বনকে আলোড়িত করে তুলেছেন— লোড়য়ামস দুষ্যন্তঃ সূদয়ন্ বিবিধান্ মৃগান্।

একদিনের মৃগয়ায় মহারাজ দুষ্মন্ত এবং তাঁর সঙ্গসঙ্গী রাজপুরুষেরা যে কীভাবে বনের পশু শিকার করে বেড়ালেন, তার তুলনা একমাত্র মুঘল আমলের জাহাঙ্গীর। দুষ্মন্ত বাঘ মেরেছেন কিছু এবং বর্শার মতো এক অস্ত্র, শক্তি ছুড়ে হরিণ মেরেছেন কতগুলি। দূরে চলমান পশুকে বাণাঘাতে এবং কাছেরগুলিকে গদাঘাতে এবং তরবারির আঘাতে শেষ করে দিয়েছেন। একটা সময়ে দেখা গেছে যে, দুষ্মন্ত এবং তাঁর যুদ্ধপ্রিয় যোদ্ধা শিকারীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাঘ-সিংহের মতো হিংস্র জন্তুও বন ছেড়ে পালাচ্ছে— লোড্যমানং মহারণ্যং তত্যজুঃণ্য স্ম মৃগাধিপাৎ। মৃগ-পশুর মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা অবশ্যই ছিল হরিণদের। যূথপতি হরিণ মারা যেতেই অন্য হরিণেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল এবং ছুটতে ছুটতে শ্রান্ত পিপাসার্ত হয়েও অনেকে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু বিমূঢ় পশুকূলের এই দুর্বিপাক মুহূর্তে মানুষের আচরণ কী? মহাভারতের কবি বলেছেন মত্ত হাতীর মতো বৃহজ্জীব, তারাও শুঁড়ের অগ্রভাগ সংকুচিত করে দৌড়ে পালাচ্ছিল। আর কিছু হাতির গায়ে অস্ত্রক্ষত তৈরি হওয়ায় তারা ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে দৌড়োচ্ছিল, তাতে সৈন্য-সামন্তও অনেক মারা পড়ল— বন্যা গজবরা স্তত্র মমৃদুর্মণুজান্ বহূন। মানুষের মধ্যে বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে, রাজার সৈন্যদের মধ্যে কতক লোক ক্ষুৎ-পিপসার্ত হরিণদের ওইভাবে মাটিতে পড়তে দেখেই তাদের নিজেদের খাবার জোগাড় করে নিল— কেচিত্তত্র নরব্যাঘ্রে রভক্ষ্যন্ত বুভুক্ষিতৈঃ। তারা তক্ষুনি-তক্ষুনি হরিণগুলির হাড়-চামড়া

ছাড়িয়ে 'রোস্ট' করার ব্যবস্থা করল। বনের মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে যেভাবে 'রোস্টেড ডিয়ার' খেতে হয়, সেই ব্যবস্থায় মন দিল তারা—

কেচিদগ্নিমথোৎপাদ্য সংসাধ্য চ বনেচরাঃ।
ভক্ষয়ন্তি স্ম মাংসানি প্রকুট্য বিধিবত্তদা।।

কোনো সন্দেহ নেই যে, মৃগয়ার মধ্যে অনর্থক পশুহত্যার একটা নেশা থাকত বলেই পরবর্তী কালে আইন-বিধান তৈরি করেছেন যাঁরা, সেইসব শাস্ত্রকারেরা মৃগয়াকে এক ধরনের কামজ ব্যসন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার এটাও ঠিক যে, রাজা যে-সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসতেন, বনের মধ্যে দিনের পর দিন ঘুরতে ঘুরতে তাদের ক্ষুধার তাড়না বাড়ত, ফলে নিশ্চিত পশুমাংস-মাত্রেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত খাবার জন্য। বনে থাকলে, এমনকি যাঁরা বনেই বসবাস করতেন— সে বনচর অরণ্যবাসীই হোক, তাঁদের মনে অবশ্য একটা সংশয় কাজ করত যে, সঠিক সময়ে সঠিক পশুটি খাবার জন্য পাওয়া যাবে কিনা। তাই অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু পশুবধ করে ফেলতেন তাঁরা এবং কখনও কখনও খিধের তাড়নাতেও বনের পশুবধে এই অতিরেক ঘটত— অতিরিক্ত খিদের সময় ভাত কম পড়বে কিনা, সেটাও যেমন অনেকে খেতে বসেই ভাবতে আরম্ভ করে, তেমন। এ-ঘটনাটা আমরা খোদ রামায়ণেই দেখেছি।

বনবাসের প্রথম দু-তিন দিন রামচন্দ্র শুধু জল খেয়েই কাটিয়েছেন, কিন্তু সেটা অভিমানবশত, নাকি রাগে, সেটা বাল্মীকি স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু বনবাসের তৃতীয় দিনে সুমন্ত্র সারথি আর চণ্ডাল-সখা গুহক যখন বিদায় হয়ে গেলেন, তারপর গঙ্গার অপর পারে অরণ্যসঙ্কুল ভূমিখণ্ডে পৌঁছেই এমন খিদে পেয়ে গেল যে, দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ অন্তত তিন রকমের বিখ্যাত প্রজাতির হরিণ ঋষ্য, পৃষত, মহারুরু এবং তার সঙ্গে একটি বন্য বরাহ মেরে নিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন— তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান/ বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্/ আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ। তিনজন মানুষ চার কিসিমের পশুমাংস পুরোপুরি খেয়েছিলেন কিনা, সে খবর ক্রৌঞ্চবিরহী মহাকবি দেননি, কিন্তু যে মহাকবি 'মা নিষাদ' বলে শোকের শ্লোক লিখেছিলেন, তাঁর কবিতার বনভূমিতে ক্ষুধার্ত মহানায়ক রামচন্দ্রের এই অনর্থক পশুহত্যাও কিন্তু বনচারীর বাস্তব। আমার মনে আছে— রামচন্দ্র সোনার হরিণ জগতে অসম্ভব জেনেও সীতার বায়নায় শুধু হরিণ-চর্মের জন্য— পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা মৃগত্বচি গতাং স্পৃহাম্— হরিণ মারলেন বৃথাই, কিন্তু এই বৃথা পশুহত্যা অথবা এই অনর্থকতার প্রশ্ন আবারও আসে যখন দেখি— মারীচরূপী সোনার হরিণ বধ করার পরেই বিষণ্ণ এবং সীতার জন্য ভয়াবিষ্ট রামচন্দ্র নিতান্ত অমনোযোগেও অন্য একটি পৃষত মৃগ হত্যা করে জনস্থানের দিকে তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন— নিহত্য পৃষতঞ্চান্যং মাংসম্ আদায়

রাঘবঃ— এখানেও হয়তো বনচারীর ভবিষ্যান্ন সংস্থানের ভাবনা ছিল, হয়তো এটাও বৃথা হিংসা নয়।

রামায়ণে মৃগয়ার বর্ণনা তেমন ধূমধাম করে কোথাও নেই, যা মহাভারতে বারবার উচ্চারিত— যদিও অনেক ক্ষেত্রেই মৃগয়ার সেই হিংস্র-ভয়ানক রূপ শৃঙ্গারে পর্যবসিত হয়েছে এবং এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। মহারাজ দুষ্মন্তের ক্ষেত্রে তো ব্যাপরটা আরও অন্যরকম হল— সেখানে বনারণ্যের অন্যতর এক চেহারা ফুটে ওঠে। একটু আগে গভীর 'মৃগয়া-বনের' মধ্যে— 'মৃগয়া-বন' কথাটা কৌটিল্য থেকে ধার করা; অনেকানেক দেখেই তিনি এই ধরনের বনের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন নিশ্চয়ই এবং সেখানে 'বায়ো-ডাইভারসিটি'র মহিমাও সম্পূর্ণ বিদ্যমান বাঘ-সিংহ-হাতি-হরিণ— সব মিলিয়ে এই 'মৃগয়া-বনের' মধ্যে বন্য এবং অ-বন্য পশুর সমহারা আধুনিকের সংজ্ঞা-তৃপ্তি ঘটায়। আরও লক্ষণীয় এই মহারণ্য যেখানে, যে-মুহূর্তে ঘনতর-ঘন থেকে অগভীর-গম্য হয়ে উঠছে, সেই মুহূর্তেই আমরা বনের অন্যতম এক তপোমূর্তি দেখতে পাচ্ছি—কালিদাসের ভাষায় সেটা 'শান্তমিদম্ আশ্রমপদম্'। কালিদাসের বর্ণনায় হয়তো মহাকবির আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা এসেছে খানিক, কিন্তু মহাভারতের বর্ণনায় দুষ্যন্ত যখন হরিণ তাড়া করতে করতে অন্য এক বনে এলেন সেখানে মাঝখানে ছিল শূন্য প্রান্তরের ব্যবধান মহচ্ছূন্যং সমাসদৎ। কিন্তু সেই প্রান্তর পেরিয়ে অন্য এক বনে ঢুকতেই সেখানে প্রকৃতির আকস্মিক এক শান্ত প্রসন্নতা দেখতে পাওয়া গেল, সে একেবারে— মনঃ প্রহ্লাদজননং দৃষ্টিরম্যমতীব চ। মুহূর্তে ভয়ানক-বীভৎস রসেরা শান্তরসের তপোভূমি হয়ে ওঠে।

এ বনের হাওয়া বড়ো শীতল, নব-তৃণের আস্তরণে সমগ্র ভূমি হরিদ্‌বর্ণ, পাখি ডাকছে, ঝিল্লির ঝিঁঝি এবং সেই আলঙ্কারিক বর্ণনা— এমন কোনো গাছই সেখানে ছিল না, যেখানে ছিল না ফুলের বাহার, ফলের সমাহার, এমন কোনো ফুল-ফলের জায়গাও ছিল না, যেখানে ভ্রমরের আনাগোনা হচ্ছে না,— নাপুষ্পঃ পাদপঃ কশ্চিন্ নাফলো নাপি কন্টকী। ষটপদৈ র্নাপ্যপাকীর্ণঃ। এমন সুন্দর ফুল্লকুসুমিত-দ্রম-দল-শোভার মধ্যে বনের প্রান্তভাগে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া মালিনী— সমস্ত প্রাণীকূলের জননীর মতো— সর্বপ্রাণভৃতাং তত্র জননীমিব বিষ্ঠিতাম। দুষ্যন্তের নবান্বেষণায় এই যে গাছগাছালি, ফুল-ফল আর ছায়াশীতল বনভূমি— এ হল বনের মধ্যে অ-বন্যতার চরম দৃষ্টান্ত, ভারতবর্ষের বেশিরভাগ বনাঞ্চলে শীত-শরতের পর্ণমোচী যে 'ডেসিডুয়াস ফরেস্ট' এর বিপুল অস্তিত্ব, যেখানে পরিবেশ-ভাবনা সম্পূর্ণ করে এক নদী— সম্পূর্ণ বনাশ্রিত প্রাণী-কুলকে যে প্রাণ দেয়— এ হল সেই রকম এক বন যার অনুরূপ দেখা যাবে রামায়ণের চিত্রকূট পাহাড়ের গোড়ায়। সেখানে চিত্রকূট পাহাড়ের সঙ্গে মন্দাকিনী নদী আছে এবং বহু ফলমূলের গাছের কথায় সমভূমির প্রসঙ্গও এসেছে— সমভূমিতলে রম্যে ধ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে। মানে 'বায়ো-ডাইভারসিটি'র চূড়ান্ত রূপ।

মহাভারত যেখানে মৃগয়াবনের অন্তর হওয়া মাত্রই মনোরম আর দৃষ্টিরম্যতার কথা বলে— মনঃপ্রহ্লাদ-জননং দৃষ্টিরম্যম্ অতীব চ— তেমনই রামায়ণেও চিত্রকূট পাহাড়ের সমভূমি সানুদেশও— বহুমূলফলং রম্যং সম্পন্ন-সরসোদকম্।

মহাভারতে এই বনের মধ্যে বহুদ্রমতা, বহু লতাপত্রগুল্মতা, বহুতর পক্ষীর খাবার এবং সমগ্র বনভূমি 'বিচিত্রকুসুমাম্বরা'— যেন বনভূমি ফুলের কাপড় পরে বসে আছে, রামায়ণেও তেমনই চিত্রকূট-মন্দাকিনীর পরিবেশে বনভূমি প্রকৃতগত ভাবে এতটাই সম্পন্ন, 'ইকো-সিস্টেম' সেখানে এতটাই সম্পূর্ণ যে, রামচন্দ্র এ জায়গাটাকে শুধু বাস করার উপযুক্ত অন্ন-পান জুটিয়ে নেবার সহজ উপাদান হিসেবেই ভাবছেন না— বহুমূলফলো রম্যঃ স্বাজীবঃ প্রতিভাতি যে— তিনি এই বনে থাকতে বেশ আনন্দ অনুভব করবেন, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। লক্ষণীয়, বনের স্নিগ্ধতা-রমণীয়তার বর্ণনায় এখানে 'পূণ্য' কথাটা মাঝে মাঝে আসছে পবিত্রতার সূচনায় এবং একটু পরেই রামচন্দ্র দেখতে পাবেন পর্বতের সানুদেশে মুনিরাও আশ্রম-বসতি তৈরি করেছেন, যেমনটি মহাভারতের দুষ্যন্ত দীর্ঘ-প্রান্তরের দৃষ্টিরম্য মহাবনের পুণ্যভাব বুঝতে পেরেছেন প্রথম থেকেই, দেখেছে— এখানেও এই শান্ত আশ্রমপদে মুনির আশ্রম— তচ্চাপ্যতীত্য নৃপতিরুত্তমাশ্রম-সংযুতম্।

দুষ্মন্ত যে আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, এখানে একটু পরেই মহাভারতে যজ্ঞভূমির বিকীর্ণ আয়োজনের কথা শোনা যাবে— যজ্ঞবিদ্যাঙ্গবিদ্ভিশ্চ যজুর্বিদ্ভিশ্চ শোভিতম্। বিশাল জপ-হোম ঋঙ্মন্ত্র-সামগানের আড়ম্বর দেখে দুষ্যন্ত তাঁর সমস্ত রাজচিহ্ন ধনুক-বাণ-অলংকার সব ত্যাগ করে আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু এর পরের ঘটনা আমরা জানি। একটু পরেই 'আশ্রম-লালামভূতা' শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যজ্ঞ-হোম, ঋক্-সামের বৃহদারণ্যক পরিবেশ তার অন্যতর প্রান্তে মনুষ্যজীবনের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের রস-রচনা তৈরি করবে। সত্যি বলতে কী, ভারতবর্ষের প্রাচীন বনারণ্যে শান্ত এবং শৃঙ্গারের উভয়-বসতি একটা বৈশিষ্ট্য বটে এবং মহাকাব্য রামায়ণে তার বিস্তার আরও বেশি। তার কারণও আছে হয়তো— কারণ, রামচন্দ্র একটা গোটা পরিবার নিয়ে স্ত্রী এবং ভাই সব বনে এসেছেন এবং সময়ও অনেকটা— চতুর্দশ বৎসর যাঁকে বনে বাস করতে হবে সেই রামচন্দ্র যতই জিতেন্দ্রিয় হোন— বনের পরিবেশ তাঁর একাদশতম ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করতে পারেনি। রামায়ণের রামচন্দ্রকে আরও বেশি উত্তেজিত করেছে নদীর সঙ্গে পাহাড়ের আয়োজন অথবা পাহাড়ের সঙ্গে নদী।

অনেকদিন চিত্রকূট পাহাড়ে বসবাস করার পর একদিন পরম উচ্ছ্বসিত হয়ে রামচন্দ্র সীতাকে বলেছেন— আমার রাজ্য চলে গেছে তাতে কোনো দুঃখ পাই না আমি, এমনকি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা যে এখানে কেউ নেই, তাতেও আমার কিছুই

খারাপ লাগছে না, কিন্তু এই রমণীয় চিত্রকূট পাহাড় আমার মন কেড়ে নিয়েছে যেন— ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ। রামচন্দ্র চিত্রকূট পাহাড়ের একটা অসম্ভব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তেমন বর্ণনা আমরা পাণ্ডবদের বনবাস জীবনে পাইনি। পর্বত-শিখরের মনোজ্ঞ বর্ণনার মধ্যে নানা ধাতু এবং খনিজ পদার্থের— শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈ-র্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্। তারপর এত রকমের গাছ, এত রকমের ফুল এই চিত্রকূট পাহাড়ের চারপাশটা ঘিরে আছে, তার মধ্যে জলপ্রপাতের মনোরম দৃশ্য এবং গুহা-সমীরণ— এর মধ্যে পণ্ডিতজন-চিহ্নিত উপজাতীয় জনজাতি হিসেবে বিদ্যাধর-কিন্নরদের বসবাস সম্পূর্ণ শৈল-বনভূমিকে এক লহমায় কামনার আবাস-দরী করে তোলে। রামচন্দ্র একান্তে সীতাকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করে দেখাতে ভোলেন না— দ্যাখো সীতা, দ্যাখো একবার, পুরুষ-রমণীর কামভোগে কেমন পিষ্ট-মর্দিত হয়ে আছে পদ্মফুলের পাপড়ি, পরিত্যক্ত হয়েছে গলার পূর্বরাগের মালা, কামনার কালে গলার আভরণও কাঁটা হয়ে ফোটে— সমস্ত উপকরণের মধ্যেই একটা ভুক্তাবশিষ্ট ভাব— মৃদিতাশ্চপাবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ। এমন এই সশৈলা বনভূমি যেখানে বারেবারেই রামচন্দ্রের মতো ধীরোদাত্ত নায়কও কামনার উপাদান নির্দেশ করেন— শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান— হয়তো আত্মশায়িত শৃঙ্গার দশায় সীতাকেও জিজ্ঞাসা করেন— আমার সঙ্গে এই চিত্রকূট পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে তোমার ভালো লাগছে তো— বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।

চিত্রকূট পাহাড়ের অবস্থান প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম দশ ক্রোশ দূরে এবং পাহাড়ের বেষ্টিত বনভূমি মন্দাকিনী নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছে সাড়ে তিন যোজন অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচ মাইল জুড়ে— ভারতার্দ্ধতৃতীয়েষু যোজনেস্বজনে বনে— ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্রকে খুঁজতে আসা ভরতকে সেইরকমই জানিয়েছেন এবং জানিয়েছেন মন্দাকিনী নদী বইছে চিত্রকূটের উত্তর দিক দিয়ে, যেখানে পাহাড়ের পরিমণ্ডল আস্তে আস্তে সমভূমিতে পরিণত হয়েছে— হয়তো এটাই পাহাড় এবং নদীর দুই পরিবেশ-উপাদান সমাপ্ত করে দেয়। রামচন্দ্র সীতাকে পাহাড় দেখানোর পরেই মন্দাকিনীর শোভা দেখাতে ব্যস্ত হয়েছেন— হংস-সারসের গমনাগমনে, শত পুষ্পের সমাহারে বিচিত্রপুলিনা মন্দাকিনী নদী দেখে রামচন্দ্র স্থির থাকতে পারেননি। সীতাকে বলেছেন— তুমি আমার সঙ্গে এখানে স্নান করবে এসো— বিগাহস্ব ময়া সহ। এমনই সুন্দর এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ যে, রামচন্দ্র আবারও অযোধ্যা এবং রাজ্যের কথা ভুলে যেতে চেয়েছেন। রামচন্দ্রের মুখে এমনও সন্তোষবাক্য শোনা গেছে যে, এই চিত্রকূট এবং মন্দাকিনীর দৃশ্য আমার কাছে অযোধ্যার গৃহবাসের চেয়েও অনেক বেশি সুখদায়ক— অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ।

নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে রামায়ণ একটু বেশিই রক্ষণশীল হলেও লোকালয় থেকে বনে আসা রাজা-রাজড়াদের বন্য জীবনে শৃঙ্গারের প্রকোপ যেন বেশি বলে

মনে হয়, হয়তো বা অরণ্যের মধুর প্রকৃতি এখানে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে। মহাভারতেও যে এমন উদ্দীপনার কথা হাজারো নেই, তা আমরা বলছি না, কিন্তু মূল নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের বর্ণনায় যদি প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহলে রামায়ণের অতি ধীর নায়ক রামচন্দ্রকে আমরা বন্য প্রকৃতির উদ্দীপনে যত বিহ্বল দেখেছি, মহাভারতের যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনকে আমরা তত বিহ্বল এবং অতি-অভিভূত দেখি না। মহাভারতে আরণ্যক প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্গারের ভাবনাটা অনেক সময়েই একটা archetype হিসাবে ব্যবহার হয়। বিশেষত মহাভারতের মূল এবং অবান্তর কাহিনিগুলি, এমনকি শাস্ত্রোপদেশ পর্যন্ত এক জটিল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণায়িত হয়, তাই আরণ্যক প্রকৃতি কখনোই এখানে একক বর্ণনার ক্ষেত্র হিসাবে আসেনা, সবসময় সেটা আসে অবান্তর গৌণতায়, খানিকটা 'ফ্রেম' হিসেবে। আর একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হল— মহাভারতের কবি যদি সত্যিই সত্যিই বদরিকাশ্রমে মানুষ হয়ে থাকেন— যদি বলছি কেন, হয়তো সেটাই ঠিক, কেন-না সদ্যোজন্মের পরেই পিতা পরাশর তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তপস্যা করতে, অথবা তিনি নিজেই গিয়েছিলেন যেখানে তপস্যার জন্য— স মাতরমনুজ্ঞাপ্য তপোস্যেব মনো দধে— অথবা যদি তা নাও হয়, তাহলে মহাভারতে ব্যাস এবং তাঁর বর্ণনীয় পাণ্ডব-কৌরবদের পর্যটন-পরিমণ্ডল থেকে বোঝা যাবে মহাভারতের প্রধান পটভূমি উত্তর ভারত। আবার উত্তর ভারতেও— যদি হস্তিনাপুর-ইন্দ্রপ্রস্থ দুটিই আজকের পুরানো দিল্লি থেকে নতুন দিল্লির পরিমণ্ডলে অবস্থিত থাকে, তাহলে পাণ্ডবদের বনযাত্রার আবাস-স্থলগুলি, জতুগৃহ-পর্বের পর পাণ্ডবদের পাঞ্চাল-যাত্রার পথ এবং আরও বহুতর বিচিত্র-দেশ বর্ণনায় হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর খুব গভীরভাবে আসে। 'আর্কিটিপিক্যালিটি'-র কথা যেটা বলছিলাম, সেখনে শৃঙ্গার-বর্ণনার স্বাভাবিক উপক্রম হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষই বলে— হিমালয়ের পাদদেশে, আর সিন্ধুদেশে আমরা ঘুরে বেড়াব, কিংবা শৃঙ্গারান্তের সামান্য common বর্ণনাতেও কোনো যুগল হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে এমন কথা শোনা যাবে---- যেমন হিড়িম্বা-ভীমের শৃঙ্গার-চক্রমণে---- হিমমদ্-গিরি-কুঞ্জেষু গুহাসু বিবিধাসু চ। আবার দ্রৌপদী-বিবাহের পর নিয়মভঙ্গের জন্য অর্জুন যে বারো বছরের জন্য বনবাসে গেলেন, সেখানেও উলূপীর সঙ্গলাভের পর অর্জুনকে সেই হিমালয় পাহাড়ের পার্শ্বদেশে দেখতে পাচ্ছি— প্রযযৌহিমবৎপার্শ্বং ততো বজ্রধরাত্মজঃ। এখানেই অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠাশ্রম এবং ভৃগুতুঙ্গে অনন্ত পর্যটন চলেছে অর্জুনের। রম্য এবং অবশ্য দর্শনীয় বনগুলির মধ্যে যদি হিমবৎ-পৃষ্ঠ, হিমবৎ-পার্শ্ব শব্দগুলি বারবার মহাভারতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে আর একটা শব্দও খুব চলে, সেটা হল চৈত্ররথ বন।

চিত্ররথ নামে সেই বিখ্যাত গন্ধর্বের নামে এই চৈত্ররথ বনের খ্যাতি তৈরি হয়েছে কিনা বলা মুশকিল। এমনকি এই বনের ভৌগোলিক অবস্থানও সঠিকভাবে নির্ণয়

করা যায় কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে, কিন্তু মহাভারতে এই বনটা প্রায় মিথিক্যাল বন বলে চিহ্নিত হয়েছে বারবার। এমনকি অন্য কোনো বনও যখন নদী-নির্ঝর-পাহাড় এবং ফল-পুষ্পের মহাসমারোহ তৈরি করা হয়েছে, তখন বলা হয়েছে— চৈত্ররথ বনের মতো এই বন— 'বনং চৈত্ররথোপমম্' অথবা 'বনে চৈত্ররথোপমে' অথবা 'তস্মাৎ বনাচ্চিত্ররথপ্রকাশাৎ' অথবা 'মহাবনং চিত্ররথ-প্রকাশম্'। এ-সব জায়গায় সরাসরি গন্দর্ব চিত্ররথের নাম থাকলেও এই মনোরথ মহাবনও যে হিমালয় পর্বতের সানু-শ্লিষ্ট কোনো বন সেটা নানা কথায় বোঝা যায়। বিশেষত এই বনের ওপর যখন চিত্ররথ-গন্ধর্বের নাম মুছে দিয়ে শিব-সখা কুবেরের অধিকার স্বীকার করা হয়, তখনই বুঝি এই বন শিবাবাস কৈলাসের কাছাকাছি। মহাভারতে পাণ্ডবরা যখন কাম্যক-বন ছেড়ে এলেন, তখন পাণ্ডব-হীন কাম্যক বনকে বর্ণনা করা হয়েছে কুবের-হীন চৈত্ররথ বনের মতো— কুবেরেণ যথা হীনং বনং চৈত্ররথং যথা। আরও স্পষ্ট জানাতে গেলে বলতে হবে— মহাভারতে এক জায়গায় যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর দিকে কোনো কোনো মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান আছে বলা হচ্ছে, সেখানে বর্ণনার আরম্ভেই বলা হচ্ছে— এই হিমালয়-পৃষ্ঠেই মহেশ্বর শিবের আবাস, এইখানেই কুবেরকে ধনাধিপতির পদে অভিষেক করা হয়েছে আর এইখানেই রম্য চৈত্ররথ বন, যেখানে বৈখানস ঋষিদের আশ্রমও আছে— অত্র চৈত্ররথং রম্যম্ অত্র বৈখানসাশ্রমঃ।

পণ্ডিতেরা চৈত্ররথের বনভূমিকে এখনকার দেরাদুন-মুসৌরির বনাঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং আমরা এই চৈত্ররথ বনকে কোনো শাস্ত্রীয়তা বা মিথ-এর ভাবনায় ভাবতে রাজি নই। কেন-না মহাভারতে এইরকম বনের হদিস অনেক আছে— 'যে সব বন চৈত্ররথ বনের মতো'— বনং চৈত্ররথং যথা এবং মহাভারতের কবির প্রধান বর্ণনীয় ভূমি যেহেতু ভারতের উত্তরদিক, তাই প্রকৃতি তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে এখানে উপস্থিত। অন্যদিকে এটাও বলতে হবে যে, মহাভারতের সমস্ত বর্ণনার মধ্যেই যেহেতু তত্রত্য মানুষ এবং সমাগত মানুষের কথাই প্রধান, তাই বন সব সময়েই এখানে পটভূমি হয়ে ওঠে, রামায়ণের কবির মতো এখানে শুধু বনারণ্যের প্রকৃতির দিকেই শুধু মন চলে যায় না। লক্ষণীয়, মহাভারতের অরণ্যযাত্রা-পর্বে যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রের অতি-সন্নিহিত কুরুজাঙ্গল-দেশ থেকে তাঁর যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন এবং যাচ্ছিলেন বহু ফল-মূল-সমন্বিত কোনো বনাশ্রয়ের আশায়, সরস্বতী নদীর দিকে। তারপর বন বলতে সঠিক যা বোঝায়, সেটা প্রথমেই ছিল কাম্যক বন। পণ্ডিতদের মতে কুরুজাঙ্গল দেশ থেকে আরম্ভ করে প্রায় একেবারে সরস্বতীর উৎসদেশ পর্যন্ত কাম্যক বন বিস্তৃত ছিল। এবং তার উত্তর দিশায় হিমালয়ের পার্বত্য বনাঞ্চল। এন.এল.দের-র মতে কাম্যক বন কুরুক্ষেত্রের পথেই কোনো মনোরম বনভূমি, যার আরম্ভ থানেশ্বরের পুবদিকে ছ-মাইল দূর থেকে। আর আধুনিক গবেষকেরা বললেন যে, কাম্যক বনের এই বিস্তারিত ভূমিটুকু থানেশ্বর থেকে এখানকার কালকা বললেই ভালো।

পাণ্ডবরা কাম্যক বন থেকে দ্বৈতবনে আসেন, আবার দ্বৈতবন থেকে কাম্যকবনে। দ্বৈতবনের অবস্থিতি মোটামুটি মিরাট থেকে উত্তরে পঞ্চাশ মাইল গেলে এবং এই জায়গাটার অপভ্রষ্ট শাব্দিক অবস্থিতি এখানকার দেওবন্দ্ এলাকায়। এবং কাম্যক-বন থেকে এটার দূরত্ব প্রায় দুশো মাইল। মহাভারতে যেমন বর্ণনা পাই, তাতে পাণ্ডবরা হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়ে গঙ্গাতীর ধরে প্রথমে কুরুক্ষেত্রে যান। সেখান থেকে সরস্বতী-দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদী এবং যমুনায় স্নান করে পশ্চিমদিকের উদ্দেশে এগোতে থাকেন, বন থেকে বনান্তরের পথ ধরে— যযুর্বনেনৈব বনং সততং পশ্চিমং দিশম্। সরস্বতীর সিকতাময় তীর ধরে পাণ্ডবরা যেখানে এসে পৌঁছোলেন সেই জায়গাটাই কাম্যক বন। এই বনের 'ইকোলজি'টা এইরকম— সমেষু মরুধন্বষু... বনং মুনিজনপ্রিয়ম্। 'মরুধন্ব' মানেই জায়গাটা পার্বত্য অঞ্চল— এখানে জল পাওয়াও যাবে, আবার যাবেও না। অমরকোষের মতে মরুধন্বা 'ধরা-ধারী' পর্বতের জায়গা হলেও অন্য পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন— 'ধন্বা' আসলে জাঙ্গল-দেশ, যেখানে জলও আছে স্থলও আছে— ধন্ব চাপে স্থলে'পি চ। আর সবচেয়ে ভালো বর্ণনা জাঙ্গল-দেশ সম্বন্ধে আছে ভাবপ্রকাশে। বলা হচ্ছে— আকাশ-ছোঁয়া উঁচু-উঁচু গাছ আছে এখানে এবং গাছগুলো সব এমন যেগুলি অল্প জল পেলেই বাঁচতে এবং বড়ো হতে সক্ষম। কীরকম গাছ সব? এখানে আছে শমী, করবী, বেল, পীলু, কর্কন্ধু, আছে হরিণের তিন-চার রকমের প্রজাতি, গাধা, খচ্চর, স্বাদু ফল আর মন-মাতানো হাওয়া— স্বাদু ফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ। সাধে কী বলেছিলাম— সেই কুরুজাঙ্গল ছেড়েই যার আরম্ভ সেই কাম্যক বনের চরম পরিণতি সরস্বতী-দৃষদ্বতী- যমুনা ছেড়ে আরও পশ্চিমে কালকা-চণ্ডীগড় ছুঁয়ে, এই বন মুনিজনের শান্ত স্বভাবের উপযোগী, এই বন অকারণ বানপ্রস্থীর খাবার জোগায় ভালো— এত তে ন্যবসন্ বীরা বনে বহুমৃগ-দ্বিজে। পাণ্ডবরা এখানে বসতি করেছিলেন।

মুনিজনের শান্ত সেব্য এই বনভূমিতে কৃষ্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকিরা এসেছিলেন, পাণ্ডিত্যের অপ্রত্যয়ে বিশ্বাস করলেও এসেছিলেন কৃষ্ণভামিনী সত্যভামা। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে তখন রাজনীতির আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। আর সত্যিই তো মহাভারত-রামায়ণের মতো অত সরল করে বনভূমির মাধুর্য প্রকাশ করে না, সাড়ম্বরে খুব স্পষ্টত প্রকাশ করে না বলেই এখানে একটি বনের হরিণও শঙ্কাশীল পরিবেশবিদের মতো 'ইকোলজি'র 'ব্যালান্স' নিয়ে ভাবনা করে। অর্থাৎ বন্য সৌন্দর্যের কবি-সুলভ বর্ণনার চেয়েও এখানে বন-অরণ্যের সুরক্ষার চিন্তা এসেছে আধুনিক এবং ভবিষ্যভাবনায় মণ্ডিত হয়ে। এটাও লক্ষণীয়, পাণ্ডবরা প্রথম চোটে কাম্যক-বনে বেশিদিন থাকেননি, যদিও অন্য বনে গেলেও বারংবার ফিরে এসেছেন সেখানে। কিন্তু প্রথমে কাম্যক-বনে কিছুদিন থাকার পরেই যুধিষ্ঠির বলেছেন— বারোটা বছর আমাদের বনবাসে কাটাতে হবে, তোমরা ভাইরা সব এমন একটা জায়গা খুঁজে বার

করো যেখানে হরিণ মিলবে বেশি, বেশি ফল-মূল, অনেক ফুল, অনেক পাখি, উপদ্রব নেই এবং ভালোমানুষেরা থাকেন যেখানে। অর্জুন দ্বৈতবনের নির্দেশ দিয়েছেন— ঠিক সেইরকম এই বন যেমনটা মানুষ চায় বসবাসের জন্য এবং মৃগ-পক্ষী, ফলমূলের গাছ ছাড়াও এখানে একটি সরোবরও আছে---- ইদং দ্বৈতবনং নাম সরঃ পুণ্যজনোচিতম্।

দ্বৈতবনে তখন কেবল বর্ষকাল এসেছে। ফলত শাল-তালের মতো উচ্চচূড় বৃক্ষের সঙ্গে আমগাছ, মহুয়া, কদম, সর্জ, অর্জুন অর কর্ণিকারের ছড়াছড়ি। এখানে পরিচিত পাখিগুলিরও ডাক ভেসে আসে কানে— ময়ূর, ডাহুক, চকোর— এখানে আছে তারা। তপাত্যয়ে বর্ষা এলেও রামায়ণের কবির মতো পরম আপ্লুতিতে বর্ষার বর্ণনা আরম্ভ করেননি দ্বৈপায়ন ব্যাস। একবার মাত্র এখানে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-ভাইদের এবং অবশ্যই দ্রৌপদীকে আমরা সরস্বতী-নদীর তীরে শাল-পিয়ালের বনে ঘুরতে দেখেছি— বিজহ্রুরিন্দ্রপ্রতিমাঃ শিবেষু/সরস্বতীশালবনেষু তেষু। কিন্তু একটি বাসস্থান তৈরি হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই হস্তিনাপুরে থাকা ব্রাহ্মণরা যেভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে ছেড়ে এসে বনবাসী যুদ্ধিষ্ঠিরের সঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন, তাতে বন্য প্রকৃতির মহিমার চেয়েও মনুষ্য-জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। এখানে একদিকে যেমন রাজনীতির অপ্রত্যক্ষ পদচারণায় ক্ষত্রিয়ের ধনুক-টংকারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঋষিদের ওঙ্কার-শব্দ মিশতে থাকে— জ্যাঘোষঃ পাণ্ডবানাঞ্চ ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্— তেমনই খানিকক্ষণের মধ্যেই দ্রৌপদী-ভীমের সেই বিখ্যাত তিরস্কার-ভাষণে যৌধিষ্ঠিরী রাজনীতি বিপর্যস্ত হতে থাকে। এই রাজনীতির ভাবনাতেই এখান থেকে অর্জুন তপস্যা করতে যান অস্ত্রলাভের উদ্দেশ্যে এবং যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়েন তীর্থযাত্রায়। কিন্তু এরই মধ্যে খেয়াল করুন, যুধিষ্ঠির তাঁর তিন ভাই আর দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরে এসেছেন কাম্যক বনে। অর্জুন তাঁর অস্ত্রশিক্ষার জন্য অন্তত পাঁচ বছর অন্যত্র ইন্দ্রলোকে ছিলেন— পুরন্দর নিয়োগাচ্চ পঞ্চাব্দান্ অবসৎ সুখী— কিন্তু লোমশ মুনি যখন অর্জুনের খবর নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, তখন তিনি কাম্যক বনে ফিরে এসেছেন— অস্ত্রহের্তো গতে পার্থে... ন্যবসন্ কৃষ্ণয়া সার্ধং কাম্যকে পুরুষর্ষভ। লোমশ মুনি এখানে আসার পরেই অর্জুন-বিরহী পাণ্ডবরা মুনির পরামর্শে তীর্থযাত্রায় বেরোন।

আসলে তীর্থযাত্রা মানেই ভারতবর্ষের অনন্ত-মধুর নদী-পাহাড়, বনারণ্যের আবরণ ভেদ করতে করতে প্রকৃতির দৈবী সম্পদ স্পর্শ করা। তীর্থগুলি তো আর এখানকার মতো পাণ্ডা-দালাল-স্বার্থান্বেষী মানুষে ভরতি ছিল না, এগুলি ছিল নদী-বন-পাহাড় পেরোতে পেরোতে কতগুলি মুক্ত শান্তিস্থল, যেখানে ঋষিরা থাকতেন এবং আসতেন সেইসব মানুষেরা— যাঁরা নাগরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে চান। কথাটা খুব ভালো বলেছিলেন— খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্বপ্নবাসবদত্তম্-এর নাট্যকার ভাস। সেখানে

এক অরণ্য-আশ্রমের মধ্যে রাজনন্দিনী আসবেন বলে পুলিশ বনের 'কন্ট্রোল' নিয়েছিল। সাধারণ অরণ্যচারী মানুষকে তারা এদিক-ওদিক হটিয়ে দিয়ে রাজনন্দিনীর তাঞ্জাম আসার পথ পরিষ্কার করেছিল। ঠিক এই অবস্থায় এক পথচারী বনারণ্যের পরিবেশ-সুরক্ষার কারণে প্রতিবাদ করে বলছে— এখানে এই তপোবনে যারা থাকে তারা বনের ফল-মূল খায়, আর গাছের বাকল পরে থাকে— ধীরস্যাশ্রমসংস্থিতস্য বসতস্তুষ্টস্য বনৈঃ ফলৈঃ— অথচ সেই বনটাকে কতগুলো অবিবেকী মানুষ একেবারে নষ্ট করে ফেলল— কোয়ং ভো নিভৃতং তপোবনমিদং গ্রামীকরোত্যাজ্ঞয়া। মানুষের এই প্রতিবাদ কিন্তু রাজপুরুষের কানে পৌঁছোয়। সে সমর্থন জানিয়ে ঋষি-মুনির আধ্যাত্মিকতার প্রশ্ন উত্তরণ করে মানুষের কথা বলে। সে বলে— কারা আসেন এই নির্জন অরণ্যবাসে, এই তপোভূমির শান্তি স্থলে? আসেন তাঁরাই যাঁরা মনস্বী, যাঁরা নগর -শহরের অনন্ত কূট যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে চান— নগর-পরিভবান্ বিমোক্তুমেতে/ বনমভিগম্য মনস্বিনো বসন্তি।

মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা অথবা বলরামের সরস্বতী-তীর্থমার্গ অনুসরণের ক্ষেত্রে নাট্যকার ভাসের ভাবনাটই 'ফ্রেম অব রেফারেন্স' হিসেবে কাজ করে। আমরা এই বিরাট তীর্থপথের বনরাজির উদাহরণ দেবে না। কিন্তু এটা বলতেই হবে যে, যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-পথ রাজস্থান-হরিয়ানা-গুজরাট থেকে আরম্ভ করে অধুনা পাকিস্তানের বৃহত্তম একটা অংশ এবং এদিকে গাড়োয়াল তথা কাশ্মীরের বৃহদংশ জুড়ে রয়েছে। ঠিক এই পর্ব শেষ করার পরেই স্বর্গলোক থেকে অথবা সুদূর উত্তর-পশ্চিম থেকে প্রত্যাবর্তমান অর্জুনের খোঁজে যুধিষ্ঠির এবং তাঁর সহপরিবার অর্জুনকে আগে-ভাগে পাবার জন্য নিজেরাও খানিকটা এগিয়ে যান গন্ধমাদন পর্বতের দিকে। মহাভারতের বনারণ্য-চর্চায় মহাভারতের এই গন্ধমাদন পর্বতের সানুচিত্রের কথা না বললেই নয়। সানুচিত্র এইজন্য বলছি যে, যুধিষ্ঠিরেরা কেউ পর্বতশৃঙ্গ বিজয় করার জন্য বেরোননি, এঁরা পাহাড়ে উঠছেন মানেই পাহাড়ের বনভূমিতে প্রবেশ করছেন, পেরিয়ে চলছেন পাহাড়ি নদী। আর এই পর্বতারণ্যের কথাও মহাভারতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, রামায়ণের রামচন্দ্রের বনযাত্রাকালে প্রধান হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভূখণ্ড। কিন্তু মহাভারতের প্রধান হল উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিমোত্তর ভারতভূমি।

গন্ধমাদন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এইখানেই ধরণীধরেন্দ্র শেষনাগ তপস্যায় বসেছিলেন মাতা কদ্রুকে ছেড়ে এসে এবং এখানেই সেই বদরিকাশ্রম— গন্ধমাদনমাসাদ্য বদর্য্যাঞ্চ তপোরতঃ। ঋষি কশ্যপ এবং তাঁর ছেলেদের তপস্যাস্থল এটাই। আরও বড়ে কথা, এইখানেই সেই শতশৃঙ্গ পর্বত, যেখানে মহারাজ পাণ্ডু— পঞ্চপাণ্ডবের পিতা তাঁর বনবাসকালের শেষাংশ কাটান এবং পাণ্ডবরাও জন্মগ্রহণ করেন এখানেই। তার মানে অর্জুনকে পেয়ে যাবার ছলে পাণ্ডবরা তাঁদের প্রিয় পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরে এসেছেন এতদিনে। পৌরাণিক ভুগোলের প্রধান গবেষক

এস.এম.আলি হিন্দুকুশ পর্বতের উপরে একটি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গকে গন্ধমাদন বলে চিহ্নিত করলেও মহাভারতে গন্ধমাদনের সন্নিকৃষ্ট অঞ্চলগুলি বর্ণনা থেকে হিন্দুকুশের চিত্রটা আসে না। বরঞ্চ এন.এল.দে মহাশয় যখন গন্ধমাদনকে রুদ্রহিমালয়ের সঙ্গে একাত্মতায় পরিবেশন করেন, তখন সেটা অনেক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। মহাভারতে দেখা যাবে— পাণ্ডবরা গন্ধমাদনে প্রবেশ করার পর সন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যে বৈশ্রবণ কুবের আবাস দেখতে পান, দেখতে পান বদরিকাশ্রম, ভাগীরথী গঙ্গার উদ্ভেদ-স্থান। দে বলেছেন— এই হল কৈলাস পবর্তমালার রুদ্র-হিমালয়, চন্দ্রচূড় শিবের মাথায় থাকা চন্দ্রকলার ছায়া, যেখানে কুবের ধনপতির উদ্যানে এসে লুটোপুটি খায়— যেমনটি কালিদাস বলেছিলেন— বাহ্যোদ্যান-স্থিত-হর-শিরশ্চন্দ্রিকা-ধৌতহর্ম্যা।

গন্ধমাদন পর্বতে প্রচুর শীত হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং হয়তো বা এই শীতের কারণেই পাণ্ডবরা বেশ সেজেগুজে নিলেন। এখানে যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও যে যুদ্ধের সাজে হাতে-পায়ে চর্মকোষ (গ্লাভস) পরে নিলেন, সেটা মনে হয় শীতের ভয়েই। গন্ধমাদনের সানুদেশ বেয়ে এগিয়ে যাবার পথে কত সরোবর, কত পাহাড়ি নদী, আর কত যে পার্বত্য বনের দেখা পেলেন পাণ্ডবরা, তার শেষ নেই— সরাংসি সরিতশ্চৈব পর্বতাংশ্চ বনানি চ। সেই বনে কত গাছ আর সেই গাছের কত শীতল ছায়া, সেই গাছ কিন্তু সবই গন্ধমাদনের পৃষ্ঠ, সানু জুড়ে— দদৃশু গিরিমূর্ধানি। প্রচুর ফুল-ফলের গাছ, বহুরকমের পশু, কিন্নর-গন্ধর্ব-জাতীয় উপজাতিক মানুষ, ঋষি-মুনি সকলের আবাস দেখতে দেখতে পার্বত্য পথ হাঁটছেন পাণ্ডবেরা এবং সে-পথ উচ্চাবচ, বিষম এবং যথেষ্ট সংকটের— চেরুরুচ্চাবচাকারান্ দেশান্ বিষম-সঙ্কটান্। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কোনো মতে গন্ধমাদনে প্রবেশ করলেন।

আমরা গন্ধমাদনের পার্বত্য অরণ্যের মহাভারতীয় অংশটুকু এইজন্য এত গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করছি, যেহেতু এই পার্বত্য-প্রদেশে একটা ভালোরকম ঝড়ের বর্ণনা পাই মহাভারতে। এই ঝড়ের বর্ণনাটাও গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, রামায়ণ-মাহাকাব্যের বিপ্রতীপ পটভূমিতে মহাভারত কখনোই বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করে না। কিন্তু এখানে করেছে, হয়তো বা অতি-উত্তরের এই পার্বত্য বনভূমিই মহাভারতের কবির অতিপ্রিয় বলে শুধু এই জায়গার একটা ঝড়-বৃষ্টির বর্ণনা কবির লেখনী স্পর্শ করেছে— চণ্ডবাতং মহদ্‌বর্ষং প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।

গন্ধমাদন পর্বতে ঝড় এসেছে— এমন কেউ সেকালে দেখেনি, কাব্যে শোনা যায়নি। মুহূর্তের মধ্যে ধুলিরাশি আর শুকনো পাতার সমুত্থানে আকাশ পৃথিবী ছেয়ে গেল— ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্। পাণ্ডবরা কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, পরস্পর কথা পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। অন্ধকারে আর ধুলোয় যখন চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তখন পাথরকুচি ঠেলে-আনা হাওয়া তাঁদেরও ঠেলে ফেলে দিতে

চাইছে। গাছের ডাল, গোটা গাছ ভেঙে পড়ছে, সেই শব্দের সঙ্গে বজ্রপাতের শব্দ মিশে বিকট আওয়াজ আসছে। প্রবল ঝড়ে একসময় তাঁদের মনে হল যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে ওপর থেকে, নয়তো বা পৃথিবী ফেটে উঠছে নীচ থেকে— দৌঃ স্বিৎ পততি কিং ভূমি/ দীষ্যন্তে পর্বতা নু কিম্? হাওয়া আর ধুলোয় নাজেহাল পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে কোথাও একটু স্থির হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পথের পাশে গাছ ধরে, উঁচু জায়গায় হাত আঁকড়ে, এমনকি উইঢিবি ধরেও তাঁরা কোথাও আটকে থাকতে চাইছেন। এরই মধ্যে বলবান ভীম কোনো মতে দ্রৌপদীকে নিয়ে একটি বড়ো গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। আস্তে আস্তে আশ্রয় খুঁজে নিলেন যুধিষ্ঠির এবং ধৌম্য পুরোহিত এক বনের ভিতর, সহদেব পার্বত্যগুহায় এবং নকুল তাঁর সঙ্গে-থাকা লোমশ-মুনিকে নিয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন।

এই বিরাট পার্বত্য ঝড়ের মহাভারতীয় বর্ণনায় আমরা শুধু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে বলছি। আপনারা খেয়াল করবেন, যাঁরা ক্যামেরায় প্রকৃতির বৈচিত্র্য-চিত্র অঙ্কন করেন, বিশেষত, যাঁরা নবিশ, তাঁরা নতুন ক্যামেরা পেলে নদী, পাহাড়, সমুদ্রের একান্ত ছবিগুলি তুলতে থাকেন। কিন্তু ছবি তোলার পর দেখা যায়, স্টিলছবিতে পাহাড়ের একফালি ঢাল, সমুদ্রের চার-ফুট ফেনা, বনারণ্যের দশখানি গাছ, আর নদীর তিরতিরে জলফলকের অংশমাত্র ধরা পড়েছে। অসীম চমৎকারে দেখা বনারণ্যের বিশাল গভীরতা, সমুদ্রের বিশালতা বা পাহাড়ের প্রকাণ্ড সৌন্দর্য কিছুই সেই চার-ছয় ইঞ্চির সীমানায় ধরা পড়েনি। ঠিক এই অবস্থায় এক ফটো-পণ্ডিত বলেছিলেন— এই বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে অথবা তোমার প্রিয়জনকেও একাংশে দাঁড় করিয়ে দাও, তাহলেই এই খণ্ড-প্রকৃতিও তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে, মানুষটা না থাকলে প্রকৃতির বিশালতা অর্থহীন আংশিকতায় পরিণত হয়। আমরা বলব— রামায়ণ আর মহাভারতের বন-চিত্রের মধ্যেও এই রকম একটা তফাত আছে। রামায়ণে ঋতুরঙ্গের বর্ণনায় বর্ষা-শরতের বনচিত্র তার নিজস্ব বিশালতায় ধরা পড়ে, মানুষ রামচন্দ্র যেখানে বাল্মীকির মতোই এক কবি, তিনি দূর থেকে বন্য প্রকৃতি নিরীক্ষণ করছেন আপন চমৎকারিতায়, কিন্তু নিজে তার মধ্যে অংশগ্রহণ করছেন না। যদি বা কোনো অংশ থাকেও, সেটা একান্তভাবেই মানসিক, সীতা-বিরহ বা তেমনই কিছু। বরঞ্চ সেই রামায়ণী বর্ণনায় সংস্কৃত রসশাস্ত্রের কাব্যিক ধারাটি বেশ বজায় থাকে— যেমনটা কাব্য-নাটকের নায়ক-নায়িকার সঙ্গম-বিরহকল্পে ঋতুর সহায়তা উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে, সেইরকম। মহাভারত এই দিক থেকে একেবারে প্রতিবিশিষ্ট। এখানকার ঝড়-বৃষ্টি, বর্ষা-বসন্তের ঋতুরঙ্গে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ছবি, প্রাকৃতিক দুর্ভোগের বিপ্রতীপে, মানুষ এখানে স্বভাবনায় নিজেকে স্থাপন করার জন্য প্রতিক্রিয়, সম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রকৃতির উদ্দীপন এখানে রুটিন ব্যাপার।

তবু রামায়ণের বন্য প্রকৃতি একান্তভাবে এবং কাব্যিক ভাবে খানিক বিচ্ছিন্ন হলেও

বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ক্রৌঞ্চবিরহী মহাকবির, 'তন্ময়ীভবনযোগ্যতা'র তারিফ না করে পারা যায় না। আসলে রামায়ণের মহাকবির একটা বড়ো বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, তিনি আপাদমস্তক ভীষণভাবে রোম্যান্টিক। বন্য প্রকৃতি তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, তিনি যেন পৃথকভাবে অবহিত হয়ে প্রকৃতির তপস্যায় বসেন। আগে থেকেই তিনি প্রস্তুত হন। কাহিনি-প্রসারের সমস্ত জটিলতা পরিত্যাগ করে তিনি তাঁর নায়ককে পর্যন্ত গুহাহিত করে বসিয়ে দেন। যেন প্রকৃতির দর্শন-যোগ্যতাও একটা অতিপৃথক গুণ, তার জন্য সমাহিত হয়ে বসা দরকার। মহাভারতে কিন্তু তা নয়, জটিল জীবন সেখানে মহাকাব্যকে এমনভাবে অধিকার করে, যেখানে প্রকৃতি আসে 'অপৃথক্-যত্ন-নির্বর্ত্য' কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে।

রামায়ণে একটা বর্ষাগমের প্রস্তুতি দেখুন। বালিবধের পর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলছেন— দ্যাখো ভাই! শ্রাবণ মাস এসে গেছে— পুর্বো'য়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ— এখন চার মাস এই বর্ষাকল চলবে। অতএব এটা কোনো উদ্যোগের সময় নয়, বরঞ্চ তুমি তোমার ঘরে ঢুকে পড়ো এবার— নায়ম্ উদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরী শুভাম্। বানররাজা সুগ্রীবকে নগর-প্রবেশের আদেশ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র একটা সময় দিলেন। বললেন— চার মাস যাক, কার্তিক মাসে তুমি সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণবধের উদ্যোগ নেবে। এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুগ্রীব বানর-পারিষদকে ছুটি দিয়ে নিজে প্রবেশ করেছেন স্বর্গত দাদা বালীর অন্দরমহলে— ভ্রাতুরন্তঃপুরং সৌম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ— ব্যঞ্জনা-মুখর কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন— বালির অন্তঃপুর মানেই সেখানে বালীর স্ত্রী তারা আছেন, তাঁর জন্য সুগ্রীবের মোহ সুবিদিত, অতএব সুগ্রীবের চার মাস বর্ষা কাটবে নিরলস শৃঙ্গারে। কিন্তু রামচন্দ্র সুগ্রীবকে পুরী-প্রবেশের আদশে দিলেও নিজে কিন্তু বলছেন— আমি কিন্তু এই পর্বতেই থাকবো— অস্মিন্ বৎসাম্যহং সৌম্য পর্বতে সহলক্ষণঃ। পূর্ণ বর্ষার সময়টুকু এই প্রস্রবণ পর্বতেই কাটিয়ে দেবো আমি।

'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি'— রামায়ণ থেকে মহামতি বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সমস্ত লেখনীতে এই প্রস্তুতি এবং নিশ্চিতি ধরা পড়েছে— আমরা এইখানেই বর্ষাকাল দেখব— দ্যাখো লক্ষ্মণ, বর্ষাকাল এসে গেছে— অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়ো'দ্য জলাগমঃ। প্রস্রবণ-পর্বতমালার অন্যতম শৃঙ্গ হল মাল্যবান এবং সেটা তুঙ্গভদ্রার তীরে আনগুণ্ডি পর্বত বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। রামচন্দ্র মাল্যবান পর্বতের এক প্রশস্ত গুহায় বসে বর্ষার বর্ণনা করছেন একেবারে নির্দিষ্টভাবে। তাঁর হৃদয়ে সীতার বিরহ-যন্ত্রণা ধিকি-ধিকি জ্বলছে এবং দৃশ্যমান অনন্ত মিলন-চিহ্ন সেখানে বিপ্রতীপভাবে বর্ষার সৌন্দর্য আরও গাঢ় করে তুলছে। বানররাজ সুগ্রীবের ভ্রাতৃবধূ-বিলাসের রমণ-রঙ্গের বিপ্রতীপে রামচন্দ্রের বর্ষাবর্ণনা বিরহের সঙ্গে কামোৎসুকতা তৈরি করে। স্বয়ং রামচন্দ্রের 'বিগিনিং নোট'-টাও কিন্তু সেই রকম, যেটাকে রামায়ণী

বর্ষা-বর্ণনার 'ফ্রেম অব রেফারেন্স' বলা যায়। কালিদাসের মেঘদূতের পিছনে যে গবেষকরা হনুমানের দৌতকল্পনাকে 'প্রায়র অ্যানটিসিডেন্ট' হিসেবে ব্যবহার করেন সেই সব স্থূল-মহান গবেষকদের পায়ে খুর-প্রণতি জানয়ে বলি— কালিদাসের মেঘদূতের সামনে যদি রামায়ণের এই মনুষ্য-রূপকে বাঁধা বর্ষাবর্ণনা না থাকত, তাহলে কালিদাসের বেত্রবতী, শিপ্রা, গোদাবরী নায়িকার মুর্ছনায় ভেসে উঠত না।

সত্যি বলতে কী, আমি যদি এখনও আমার মনঃশরীরে পঁচিশ বছরের যৌবন-লুব্ধতা থাকত, তাহলে রামায়ণের রামচন্দ্রের এই বর্ষা-সম্ভোগ আদ্যোপান্ত বাংলা ভাষায় বলতাম। তবে কিনা এটা শুষ্ক প্রবন্ধের পরিসর, তায় এই অমানুষী ভাষা নাই, নক্ষত্রের মতো শ্রোতা নাই— অতএব স্তব্ধ থাকুক বর্ণনা, কিন্তু এটা তো বলতেই হবে যে, মহাকবির অপূর্ব-নির্মাণ-নিপুণতায় মেঘ-গর্জনের মৃদঙ্গ-ধীর ধ্বনির সঙ্গে যেখানে ভ্রমর-গীতের বীণা বাজে, এবং তার সঙ্গে ভেক-কুলের উচ্চরিত শব্দ কণ্ঠতালের কাজ করে, সেখানে বনের মধ্যে 'কনসার্ট' শুরু হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বন্যভাবে সমাহিত করে তোলে— আবিষ্কৃতং মেঘ-মৃদঙ্গ নাদৈ/র্বণেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্। বর্ষার ধারাসারে আপ্লুত এই পার্বত্য বনস্থলীর মধ্যে বাল্মীকি যে মহা-সমারোহ তৈরি করেছেন, প্রত্যেকটি বন-বৃক্ষ যেখানে নবাম্বুধারায় সিক্ত— সর্জার্জনু-কন্দলাঢ্যা/ভূমি-র্মধুবারি-পূর্ণা— প্রত্যেকটি নদী যেখানে বৃষ্টিবীর্যপাতে ব্যভিচারিণী রমণীর মতো উচ্ছলা তরঙ্গিণী, প্রত্যেকটি মৃগপক্ষীর ব্যবহার পালটে গেছে বর্ষাগমের বন্য ব্যাকরণে, ইকোলজির প্রত্যেকটি উপাদান এখানে মূর্খ গবেষকের মতো মুখস্থ বলে যাওয়া যায়, অথচ আমি পারি না সেই মোহময়ী বনবর্ণনা পুনরাবৃত্ত করতে— আমার অমানুষী ভাষা নাই, নক্ষত্রদিগের মতো শ্রোতা নাই। কিন্তু এই সম্পূর্ণ বর্ষা-বর্ণনার মধ্যে মহাকবির সমাজ-নৈতিকতায় ভরা মনও রামচন্দ্রের মতো ধীরোদাত্ত নায়কের মুখ দিয়ে বন্য সত্য উচ্চারণ করে, মুহূর্তের মধ্যে বর্ষাসিক্ত বনস্থলী আদিকবির উপমাঙ্গুলি-সংকেতে মানুষের অন্তরশায়ী আদিবৃত্তিগুলিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে— বর্ষার আকাশ থেকে আরম্ভ করে বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ— সকলেই কামুকতার মানুষ-চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে ওঠে, আর ঠিক এইখানেই রামায়ণের বনস্থলী আর শুধুমাত্র বন থাকে না, সে মনুষ্যধর্মী হয়ে ওঠে।

প্রথম আরম্ভটাই কী সাংঘাতিক! আকাশ নাকি কার্তিক থেকে আরম্ভ করে ন-মাস সূর্য-কিরণ সম্পাতে উঠে আসা সমুদ্রজলের গর্ভধারণ করার পর মেঘের রসায়ন ঢেলে দেয় এই পৃথিবীতে— নব মাস-ধৃতং গর্ভং ভাস্করসতং গভস্তিভিঃ। এর পরে ঘন মেঘে অবলিপ্ত আকাশের সঙ্গে পৃথিবীকে জুড়ে তিনটি উপমা দিয়েছেন রামায়ণের কবি এবং বাস্তবিক এই তিনটি উপমার অলংকার ধ্বনির জন্য আমি মরে যেতে রাজি আছি— আই ক্যান জাস্ট্ ডাই ফর দেম্। মহাকবির অনুভব-বেদ্য উপমা-হৃদয় যদি ধ্বনির আবরণ ভঙ্গ করে বুঝিয়ে বলতে হয়, সেও এক মরণ বটে, তবে যদি বুঝিয়ে

না বলি, তবে আমার সহৃদয়-হৃদয়ও তো দগ্ধে দগ্ধে মারা যাবে।

আমরা ক্ষতস্থান সাদা কাপড় দিয়ে বেঁধে 'ব্যান্ডেজ' করি। কিন্তু সাদা মেঘকে যে 'ব্যান্ডেজ'-এর কাপড় হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি না। বাল্মিকী লিখেছেন— সন্ধ্যার অস্তরাগে রঞ্জিত আকাশ তামাটে লাল হয়ে উঠেছে এবং তার প্রান্তস্থলগুলিতে শ্বেত-পাণ্ডুর অভ্র-মেঘের ছেঁড়া কাপড়। মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যারুণ আকাশটাকে ছিন্নপটে বেঁধে দেওয়া হয়েছে— ছিন্নৈরভ্রপটচ্চৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্। ঠিক এইরকম একটা তুলনার পরেই একেবারে উলটো কোটিতে গিয়ে আকাশের অবস্থাটা এইরকম— আকাশে হাল্কা মেঘ জমলে হাওয়ার বেগ মন্দীভূত হয়, সেই সুযোগে কবি লিখছেন— আকাশ হয়ে উঠেছে কামুকের মতো। তার গায়ে-মুখে সন্ধ্যাচন্দনের শৃঙ্গারলেপ, তার কবোষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে অল্প অল্প— সেটাই মন্দগতি সমীরণ— সাদাটে মেঘে আকাশটাকে মনে হচ্ছে যেন কামুক পুরুষের মতো এগিয়ে আসছে তাপক্লান্তা বসুন্ধরার দিকে— আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্। আর তৃতীয় উপমা হল— মসীকৃষ্ণ নীল মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস রাবণের কোলে অপহ্রিয়মাণ সীতা, যিনি নিরন্তর বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন রাবণের হাত থেকে চপলা বিদ্যুতের মতো— নীলমেঘশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফূরন্তী প্রতিভাতি মে।

বনের মধ্যে এই বর্ষাগম-সমারোহ, যেখানে ধরণী আক্রান্ত, পুনরাক্রান্ত হতে-হতে সবলে বীর্যসিক্তা হন, যেখানে সমস্ত বন্য প্রাণীর সঙ্গে মিলনের মোহ— যেখানে নদী সাগর-মিলনের জন্য দ্রুতবাহিনী, যেখানে 'জাতা বৃষা গোষু সমানকামা', যেখানে বর্ষার উদ্দীপনে রমণী স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয় প্রিয় মিলনের জন্য---- কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি, সেখানে একেবারেই বিপ্রতীপে বিরহবিধুর রামচন্দ্র পর্বতের সানুদেশে কুসুমিত কূটজ কুসুমের সমারোহ দেখে কামনায় আকুল হচ্ছেন। বস্তুত মানুষের মিলন-বিরহের সঙ্গে বর্ষাসিক্ত বনস্থলীর এই সমাপতন— এটাই ক্রৌঞ্চবিরহী কবির চোখে প্রকটভাবে ধরা পড়ে— এখানে কখনও সম্পূর্ণ বনস্থলী মনুষ্যায়িত হয় বিরহ-সম্ভোগে, পরমুহূর্তেই মানুষ এখানে বন্য হয়ে ওঠে অবিবেকীর মতো। তা নইলে রামচন্দ্রের ধীরোদাত্ত নায়ক ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বানর সুগ্রীবের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে বলতে পারেন— এই আলোড়িত বর্ষাকালে সুগ্রীব কেমন স্ত্রীর সাহচর্যে সুখে দিন কাটাচ্ছে— ইমাঃ স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্নুতে— আর আমি! আমি রাজ্য থেকে বিতাড়িত, আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত হরণ করে নিয়ে গেল— বর্ষার নদী উচ্ছলতায় দৌড়াচ্ছে, আর আমি বসে আছি সেই নদীর বেগ-বিধ্বস্ত নদীকূলের মতো— নদীকূলমিব ক্লিন্নম্ অবসীদামি লক্ষ্মণ।

ঠিক এখানেই একটা ধাক্কা আসে রামায়ণে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ এখানে এক

পৃথক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বন্য প্রকৃতিকে অনুভব করে— ওরা এই রকম, আর আমি এইরকম, ওরা ভালো আছে, আমি ভালো নেই। হয়তো রামায়ণের মহাকাব্যিক পরিস্থিতিই তার মহানায়ককে এমন পৃথগহস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে— যেখানে দূর থেকে দেখেন বলেই তিনি বন্য প্রকৃতিকে আরও মধুরভাবে বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই মধুরতার সাক্ষাৎ অংশীদার নন, তিনি বন্যপ্রকৃতিকে ভোগ করেন বিপ্রতীপ বাসনায়। রামায়ণের কবির বর্ণনা চমৎকার চরম বিন্দু স্পর্শ করে, যখন বিরহী রামচন্দ্রের সামনে পার্থিব প্রকৃতির প্রত্যকটি উপকরণের মধ্যে শরৎ-লক্ষ্মীর আপন সৌন্দর্য-ছায়া ভেসে ওঠে— শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা। বর্ষার ধারাসার স্তিমিত এবং স্তব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরতের অকাশ, নদীপুলিন, পশু-পক্ষী সর্বত্র এমন একটা উচ্ছ্বাস তৈরি হয়, যাতে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রকট হয়ে ওঠে, সেটা হল 'গতি'। বর্ষার নিয়মিত, অনিয়মিত ধারাসার একসময় যেহেতু জন-জীবনের গতি স্তব্ধ করে দেয়, তাতে বনভূমি মতো প্রকৃতির উৎকৃষ্ট আসনখানিতেও যেন পচন ধরে। প্রথম বর্ষাগমে বনভূমিতে যে বর্ষাভিসার তৈরি হয়, শেষ বর্ষায় সেটাই দুর্বহ হয়ে ওঠে। রামচন্দ্রের মতো মানুষকেও তাই বর্ষাশেষের লগ্নে বলতে হয়— এই চারটে মাস গেল, যেন মনে হল একশো বছর কাল— চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ। অবশ্য রামচন্দ্রের মনে সীতাহরণ-জনিত বিরহভাব এবং শরৎকালের অপেক্ষা, কেন-না শরতের স্নিগ্ধ শুদ্ধতাতেই সীতার অন্বেষণ আরম্ভ হবে— এগুলিও তাঁর মনে বর্ষার ক্লান্তি এনে থাকবে, তবে এটাও বড়ো ঠিক যে, শহর-নগরেই যেখানে বর্ষার অবিরাম ধারাপাত জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে, সেখানে বনভূমিতে কূলপ্লাবিনী নদী, সরোবর, বনস্থলীর কর্দমাক্ত পথ এবং তন্মধ্যে খাদ্যসংগ্রহের জৈবিক কষ্ট, এগুলি হয়তো সাধারণভাবেই বনভূমির বর্ষাকাল সম্বন্ধে রামচন্দ্রের মনে ক্লিষ্টতা তৈরি করেছে। আর ঠিক এই পরিপ্রেক্ষায় শরতের মেঘ-মুক্ত আকাশ, শুকনো পথঘাট, উৎফুল্ল গতিসঞ্চারে ভ্রাম্যমান পশুপাখির কলতান— এগুলি বৃষ্টির কবল থেকে বেরিয়ে আসা বনভূমির এক ক্লিষ্ট মানুষকে এতটাই আবেগে আপ্লুত করে যে, রামচন্দ্রের মতো ধীর মানুষও বর্ষোত্তীর্ণ শরতের নদী সম্বন্ধে বলে ওঠেন— নবসঙ্গমে লজ্জিতা নববধূ যেমন একটু-একটু করে তার জঘনদেশ প্রকট করে, নদীগুলিও সেইভাবে একটু একটু করে তাদের পুলিনদেশ প্রকট করে তুলছে অর্থাৎ নদীর জল কমছে, তার পাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠছে শুষ্কতায়— নবসঙ্গম-সব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ।

রামায়ণের কবি-নায়কের কাছে বনভূমি এইভাবেই এক 'পৃথক-যত্ন-নির্বর্ত্য' বর্ণনার পরিসরেই ধরা দেয়, এবং এখানে পৃথক এক প্রস্তুতি আছে, যেখানে কবি সহৃদয় অবহতি হয়ে বসেন বনের মাঝে কী আর্তব পরিবর্তন ঘটছে— সেটা দেখার জন্য এবং শোনার জন্য, রামায়ণের মহানায়কও এখানে নিসর্গ-প্রকৃতির একটি অঙ্গমাত্র। বনের পশু-পাখির সঙ্গেই তিনি একাত্ম হয়ে ওঠেন সম্ভোগে এবং বিরহে। মহাভারতে

কিন্তু এমন জায়গা প্রায় নেই-ই, যেখানে মহাভারতের কোনো চরিত্র ঋতুর আগমনে আলোড়িত হয়ে বনস্থলীর প্রান্তদেশে এসে দাঁড়াবেন এবং অন্যতরকে অবহিত করে বলবেন— দ্যাখো লক্ষ্মণ! বর্ষাকাল এসেছে বলে পর্বতের সানুদেশ জুড়ে কেমন কুর্চি-কুটজ-ফুলের সমারোহ তৈরি হয়েছে— কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু। রামায়ণে যে-কটি বনের আমরা হদিস পেয়েছি— অন্তত যে-কটিতে রামচন্দ্র থেকেছেন বলে হদিস পেয়েছি— সেটা চিত্রকূট পর্বতই হোক, কিংবা দণ্ডকারণ্য, অথবা সেটা পম্পা-সরোবরই হোক অথবা গোদাবরীর তীরভূমি অথবা জনস্থান, পঞ্চবটী, সেখানকার 'ইকোলজি'তে সমবিষম ভূমি থেকে আরম্ভ করে নদী-সরোবর, হাজারো পক্ষী এবং ততোধিক বৃক্ষের নাম পেয়েছি আমরা। তার মধ্যে কুষ্ঠ, স্থগরক, পুন্নাগ, ইঙ্গুগী, ভুর্জ আমাদের এখানকার কানে তত চেনা লাগবে না, কিন্তু শাল, বেল, বদরী কিংবা সরল গাছ, কর্ণিকার, খেজুর, পিয়াল, কেতকী, কদম্ব, ছাতিম, কোবিদার বৃক্ষকে আমরা ভালোরকম চিনি। আর এই সব বিভিন্ন গাছের সংখ্যাধিক্যই কিন্তু বাসযোগ্য জঙ্গল, অরণ্য থেকে গভীর অরণ্যানীর পথে নিয়ে যায়।

কিন্তু রামায়ণের যেটা সরল বৈশিষ্ট্য, সেটা হল, বন-অরণ্য এখানে প্রাকৃতিকভাবে বড়ো বেশি উপভোগ-যোগ্য, আর উপভোগের মধ্যে যেমন একাত্মতার একটা ভূমিকা থাকে, তেমনিই একটা স্বতন্ত্র এবং পৃথক অবস্থানেরও প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ বনের মধ্যে বর্ষাগম ঘটলে, অথবা শরৎ-লক্ষ্মী যদি তাঁর সৌন্দর্য বিছিয়ে দেন বনস্থলীর সর্বত্র, তাহলে সেই বন্যপ্রকৃতি উপভোগ করার জন্য একটা পৃথক সত্তারও প্রয়োজন হয়— যে সত্তা থাকে মহাকবির হৃদয়-পুণ্ডরীক জুড়ে, যে সত্তা আদিকবি বাল্মীকির অথবা যে সত্তা বাল্মীকির মনোজন্মা রামচন্দ্রের। তবে রামায়ণের বনস্থলীর বিশ্লেষণে এই কবিসত্তা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বেশ উপেক্ষা করে এবং সেটা হল— বন-অরণ্যের অন্তর্নিহিত বাস্তবটুকু। কবিত্ব এবং প্রাচুর্য দুটোই হয়তো এখানে এমন হাত ধরাধরি করে চলে যে, সীতা-হরণের পরের মুহূর্তেও রামচন্দ্র যখন চরম আশঙ্কায় ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তখনও তিনি একটি পৃথক হরিণ মেরে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন— নিহত্য পৃষতঞ্চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ।

যদি বলি, এই সময়ে রামচন্দ্রে মাথার ঠিক ছিলনা, 'নার্ভ' ঠিক রাখার জন্যই তিনি একটি হরিণ মেরে এনেছেন, তাহলে বলবো— রামায়ণের কালে বন্য প্রকৃতির উপভোগ্যতার জায়গাতে বন্য পশুর মাংসও উপভোগ্য হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে, কেন-না রামায়ণে তিনটি প্রাণীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মৃগবধ করতে দেখেছি। অথচ বনের পশু-সংরক্ষণের কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তা এখানে দেখিনি। একই কথা 'এথনিসিটি' সম্বন্ধেও আসবে। রামায়ণে আমরা বনবাসী জাতি-উপজাতির পরিচয় তত পাই না। যা পাই, তা ধরতে গেলে খুব স্থূল সূত্রে রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নরদের কথা আসবে, আর মানুষের কাছাকাছি কল্পনায় বানরদের প্রসঙ্গ আসবে, আর বড়ো

জোর নিষাদ-জনজাতির কথা আসতে পারে। এঁরা সব মহাভারতেও আছেন, কিন্তু কেন জানি না, এই সব রাক্ষস-দৈত্য-দানব অথবা গন্ধর্ব-কিন্নর-বিদ্যাধরদের সম্বন্ধে যতখানি অতিমানুষী কল্পনা রামায়ণে আছে, তাতে রামায়ণের দেবতারাই দ্যুতিহীন হয়ে ওঠেন, সেখানে নিষাদ ইত্যাদি জনজাতির কথা গৌণ হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, রামায়ণে রাক্ষস, দৈত্য, দানবরা যেন এক পৃথক জগতের অধিবাসী, চলমান আর্য সভ্যতার সঙ্গে তাঁদের যেন কোনো যোগাযোগই নেই, যতটুকু আছে তাও শত্রুতার সম্পর্ক। তা ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা আর্য সভ্যতার পরম প্রতীক দেবতাদের চেয়েও বেশি শক্তিমান। তাঁরা মায়াবিদ্যা জানেন, যখন-তখন অন্য রূপ ধারণ করতে পারেন, দেবতাদের মতো তাঁরাও অনেকে বিমান-চালনায় অভ্যস্ত, তাঁরা আকাশে উড়ে যেতে পারেন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা এমনকি শীত-বসন্তের মতো ঋতুকেও তাঁরা ইচ্ছেমতো চালনা করতে পারেন। দেবতা এবং মানুষের প্রতিস্থানে আমরা রাবণ-রাজাকে এমনটাই মহাজাগতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ দেখেছি। এই ধরনের মহাজাগতিক শক্তি আমরা বানরদের মধ্যেও দেখেছি। হনুমান, বালী, অঙ্গদ, জাম্ববান— অলৌকিক শক্তিতে এঁরাও কিছু কম নন। কিন্তু রামায়ণে রাবণ এবং তাঁর রাক্ষস প্রজাতির তুলনায় তাঁরা নিতান্তই নিষ্প্রভ। পণ্ডিতকুলের কেউ কেউ রাবণ এবং তাঁর রাক্ষস-বাহিনীর পূর্বস্মৃতি লক্ষ করবার চেষ্টা করেছেন গোঁদ উপজাতির মধ্যে, কেন-না এখনও তাঁরা রাক্ষস রাবণকে নিজেদের 'হিরো' মনে করেন আর বানররা নাকি শবর-কোর্কু উপজাতির পূর্বপ্রতিভূ। এই পণ্ডিত-গবেষকদের সঙ্গে আমরা তর্ক করতে যাব না। কেন-না রামায়ণের প্রমাণে রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃতে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন, আমরা হনুমানকেও একই রকম দেখেছি, বানররাজ বালীকে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখেছি। তবে এই প্রমাণগুলিও যেমন রামায়ণের বানর-রাক্ষসের আর্যকৃষ্টির কাছাকাছি কোনো পদবিতে নিয়ে আসে না, কেন-না তাঁদের অন্যান্য অনেক স্বভাবই 'অ্যাবরিজিনলা'দর মতো। আবার তাঁদের মধ্যে এমন অনেক 'ট্রেইট্স্'আছে, যা থেকে তাদের পুরোপুরি 'অ্যাবরিজিনাল'-ও বলতে পারি না। আর গোঁদ-উপজাতির 'হিরো হিসেবে রাবণের নাম ভেসে এলেই তিনি যে তাঁদের পূর্বনায়ক, সেটাও জোর করে বলা যায়না। আমার এই পূর্ব ভারতে বসে উত্তর ভারতের রাম, কৃষ্ণ, কতজনকেই হিরো হিসাবে মেনে নিয়েছি, তাতে করে কি এটা প্রমাণ হয় যে, তাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ! জাতি-বর্ণের 'সোশ্যাল মোবিলিটি'তে কখন কে যে কাদের 'হিরো' হয়ে যান, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আসলে গোঁদ উপজাতীয়দের মধ্যে 'রাবণবংশী' নামে একটি উপবর্ণের কথা শুনেই এই মন্তব্য করেছেন পণ্ডিতেরা। রামায়ণের রাক্ষসেরা অনেক গবেষকের মতে প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক, আবার কখনও বা মধ্যপ্রদেশে থেকে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত

বিস্তৃত অঞ্চলের 'কুই' উপজাতি মানুষ। আমরা বলব রাক্ষসই হোক আর বানরই হোক, রামায়ণের এই দুই প্রজাতির মানুদের নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। বরঞ্চ রামায়ণের বর্ণনা এবং রাক্ষসদের সম্বন্ধে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অসাধারণ মন্তব্য 'the exaggerated sketches of human beings'— এটা মেনে নিয়েই বলি রামায়ণের মহাকবি বন-অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত ছিলেন যে, তার 'ইকোলজি'র অন্যতম অঙ্গ 'এথনিসিটি' নিয়ে তিনি বেশি মাথাই ঘামাননি। রাক্ষস, বানর এবং নাগ-জাতীয়রা ছাড়া রামায়ণ আরও দু-চারটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও রামায়ণের এই অংশ প্রক্ষেপ-কলঙ্কে আলোপিত। আমরা যদি এই কলঙ্কে বিশ্বাস না-ও করি, তাহলেও বলব যে, এই উপজাতীয় গোষ্ঠী নামে-মাত্রই রামায়ণে উল্লিখিত, অন্তত রামায়ণের বর্ণনা থেকে তাঁদের বন্য জীবন, জীবনযাত্রা-প্রণালী, তাঁদের খাদ্য, তাঁদের ব্যবহার— এগুলি খুব নজরে আসে না।

তবে হাঁ, এটা বড়ো ভাগ্য বটে যে, তবু উপজাতীয় বনবাসী এইসব মানুষের সঙ্গে আমাদের বনেই দেখা হয়েছে। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই— বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের একটা পুরাণ-প্রতিথ ঝগড়া ছিল। সেই ঝগড়া যাঁকে নিয়ে বাধে, সেটি ছিল বশিষ্ঠের কামধেনু সুরভি, রামায়ণে তাঁর নাম শবলা, কালিদাসের নন্দিনী। এই গাভীটি বশিষ্ঠের ইচ্ছে অনুসারে বস্তু-প্রসব করত এবং একদিন যখন বশিষ্ঠের অরণ্য আশ্রমে সৈন্য-সামন্তসহ আচমকা অতিথি হয়ে এসে বিশ্বামিত্র দেখলেন— আরণ্যক মুনির ঘরেও সুখাদ্যের অভাব নেই এবং তার প্রাচুর্যও কম নয়, সেদিন তিনি বশিষ্ঠের শবলা গাভীটি চেয়েই বসলেন। অরণ্য জীবনে বশিষ্ঠ্যের এই গাভিটি ছিল জীবনধারণের আশ্রয়। বিশ্বামিত্র জোর করে গাভীটি নিয়ে যেতে চাইলে বশিষ্ঠ শবলাকেই বললেন— আমি তো এই রাজার সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠবো না, তুমি নিজেই নিজেকে বাঁচানোর জন্য শত্রুবিনাশী সৈন্য সৃষ্টি করো— সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্।

বশিষ্ঠের কথা শুনে কামধেনু শবলা ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের সৈন্য বিনাশের জন্য যে সৈন্য সৃষ্টি করলেন, প্রথম পর্যায়ে সেই সৈন্যগুলি ছিল পহ্লব জনজাতীয় গোষ্ঠী। পরের পর্যায়ে শক-যবদের দেখতে পাচ্ছি— এবং তৃতীয় পর্যায়ে কাম্বোজ, বর্বর, হারীত, কিরাত, ম্লেচ্ছদের বশিষ্ঠ-সৈন্য হিসেবে কাজ করতে দেখেছি— রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ— এবং তারা নিমেষে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়-সৈন্য বিনাশ করে ফেলল। রামায়ণে এই যে কতগুলি উপজাতীয় মানুষের নাম-মাত্র পেলাম, এ-ছাড়া কিরাত গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি উপশাখার নাম পাব রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে— তারা দ্বীপবাসী, মাথায় চূড়া করে চুল বাঁধে, গায়ের রং ফর্সা, দেখতেও বেশ ভালো, আবার কাঁচা মাছ খায়। কিন্তু দেখতে বিকট এমন কিরাতদের কথাও শোনা যাচ্ছে—

কিরাত স্তীক্ষ্নচূড়াশ্চ হেমাভাঃ পিয়দর্শনাঃ।
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বীপবাসিনঃ।।

রামায়ণে এই যে-সব জনজাতির কথা শুনলাম, এঁদের মধ্যে কিরাত, বর্বর এবং ম্লেচ্ছরা ছাড়া অন্যগুলির যা নাম, তাতে সেগুলিকে আরণ্যক জনজাতি বলতে পারি না কিছুতেই, এবং তাঁরাই রামায়ণে রক্ষস-বানরদের পাশে অনেক বেশি 'কমন'। রামচন্দ্রের নির্ধারিত অভিষেকের সময়ে দশরথ এই যবন, শক, ম্লেচ্ছদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকেছিলেন বলেই আরও বলতে পারি এঁরা অরণ্যের পরিসরে জীবনযাপন করতেন না। ইতিহাসের প্রমাণে আমরা জানি যে পহ্লব-রা হলেন 'পার্সো-পারথিয়ানস্', শক-রা অবশ্যই 'সাইথিয়াসন' এবং যবনরা গ্রিক। এই সব জনজাতির নামোল্লেখ দেখেই রামায়ণের এই অংশকে খ্রিস্ট-পরবর্তী সময়ের প্রক্ষেপ বলতে প্রবৃত্ত হয়েছেন অনেকেই। এটা অবশ্যই ঠিক যে, সবচেয়ে পুরোনো জনজাতি রামায়ণে যদি কেউ থাকে, তবে তাঁরা হলেন কিরাত গোষ্ঠীর মানুষ। আর আছেন ম্লেচ্ছরা, যদিও ম্লেচ্ছ বলতে একটি কোনো বিশেষ উপজাতীয় গোষ্ঠীকে বোঝায় না। বরঞ্চ বোঝায় তাঁদের যাঁরা সংস্কৃত সঠিক উচ্চারণ করতে পারতেন না এবং যাঁদের আচার-আচরণ, ব্যবহার আর্য সাংস্কারিক পথে চলত না। একই সঙ্গে এটাও বলে নেওয়া ভালে যে, কিরাতই হোক, কাম্বোজই হোক, ম্লেচ্ছই হোক অথবা বর্বরই হোক, তারা রাক্ষসই হোক বা বানরই হোক, রামায়ণে এই সমস্ত জনজাতিই কতগুলি culturrally evolved state-এর অঙ্গ— অর্থাৎ এঁদের আরণ্য প্রকৃতি খানিকটা যেন ধূসর হয়ে এসেছে। বরঞ্চ শুধু রাক্ষস বলে যাঁদের পরিচয়, তাঁদের আচার-আচরণ, দস্যু ভাব, খাদ্যের প্রয়োজনে আক্রমণ এবং অসম ভদ্রাচারীদের প্রতি তাঁদের মনোভাব— এগুলি বরঞ্চ আরণ্য প্রকৃতির ব্যাখ্যা করে।

লক্ষ্যণীয় এই যে, বনচর রাক্ষস, তাঁদের বৃত্তি এবং প্রকৃতি নিয়ে বক্তব্য নিবেদন করেছেন, যাঁরা, রামায়ণে তাঁরাও কিন্তু বনচর। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিরা রামচন্দ্রের কাছে অন্যতম বনচর রাক্ষরদের ধ্বংস করার জন্য প্রার্থনা করেছেন বনচর মানুষ হিসেবেই— তাবুচুস্তে বনচরাস্তাপসাঃ) ধর্মচারিণঃ। ঋষিরা বলতে চান— তাঁরা বনচারী এবং ধর্মচারী। কিন্তু যাদের জন্য তাঁদের অসুবিধে হচ্ছে, তারা মানুষ খায়, নানারকম তাদের চেহারা, এবং তারাই সারা বন ছেয়ে আছে —বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্। হঠাৎ করে রাক্ষসদের ওপরে এই যে এখটা 'ক্যানিবালিজম' চেপে গেলে— মুনিরা বলছেন— রাক্ষসেরা আমাদের টপটপ্ ধরে খেয়ে নেয়— অদন্ত্যাস্মিন্ মহারণ্যে তাপসং ধর্মচারিণম্— এই 'ক্যানিবালিজম্'-এর ভাবনাটাকে খানিক অতিশয়োক্তি ধরে নিয়েই বলা যায় যে, রাক্ষসেরা 'প্রিমিটিভ' এবং 'ফেরোশাস' বটে, কিন্তু তারা বনবাসী। আর 'ক্যানিব্যালিজম' সেই পরিমাণে থাকলে বনারণ্যে এত মুনি-ঋষির বাস কোথা থেকে এমন বিপুল হয়ে ওঠে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিরা

যাঁরা রামচন্দ্রের কাছে রাক্ষস নিধনের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রকৃতি এবং প্রকার শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

তারা অনেকে প্রজাপতি ব্রহ্মার নখজাত, অনেকে প্রজাপতির লোমজাত, কেউ কেউ প্রজাপতির চারণপ্রক্ষালণেৰ সময়ে উৎপন্ন এবং অনেকেই এতটা কৃচ্ছ্রসাধন করেন যে, সূর্যের কিরণ পান করে তাঁরা জীবনধারণ করেন— বৈখানসা বালখিল্যা সম্প্রক্ষালা মরীচিপাঃ। আরও যাঁরা আছেন বনে এবং যাঁরা রামচন্দ্রের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা কেউ কাঁচা চাল খান, কেউ গাছের পাতা খেয়ে বাঁচেন, কেউ কেউ যেমনটি পাচ্ছেন চিবিয়ে খাচ্ছেন, কেউ গলা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, কেউ মাটিতে শুয়ে থাকেন পর্ণশয্যা ত্যাগ করে, কেউ বা প্রায় নিদ্রাই যান না, কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন, কেউ বায়ুভোজী, জলাহারী, আর্দ্রবস্ত্রে থাকেন— অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসঃ। দেখুন, এই যে নিয়মব্রতে সমাস্থিত ঋষি-মুনি-জন— আর্য় সমাজের প্রধানতম প্রতীক— তাঁদের বিপ্রতীপে রাক্ষসরা যা কিছুই খান, সেটাকে 'ক্যানিবালিজম্' মনে হবে। বরঞ্চ এটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, এই দুই পক্ষই বনচর, দুই পক্ষই বনের প্রকৃতিকে ধারণ করে আছেন এবং হয়তো বা এই কারণেই দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদের 'দ্বিষো জহি' প্রার্থনা শুনেও জনকনন্দিনী সীতা রামচন্দ্রকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, —তুমি যদি মুনি-ঋষিদের কথা শুনে দণ্ডকবণের সমস্ত বনচর মানুষদের উদ্দেশে বাণ-ক্ষয় করো, সেটার জন্যই আমার এই বনে যেতে ইচ্ছে করছে না— দৃষ্টা বনচরান্ সর্বান্ কচ্চিৎ কুর্যাদ্ শরব্যয়ম্।

খুব লক্ষণীয় এটা যে, সীতার মতো নমনীয় স্থির ব্যক্তিত্ব— দেব-দ্বিজে তাঁর অসীম ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু এঁদের রাক্ষস হিসেবে দেখেছেন না, দেখছেন বনবাসী হিসেবেই। আর সত্যি বলতে কী, রামায়ণের কালে এঁদের রাক্ষস বলা হচ্ছে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা যুগের পর থেকেই 'প্রিমিটিভ' বনারণ্যবাসী মানুষের সঙ্গে আর্যজনের সম্পর্ক হল আক্রান্ত এবং আক্রামকের। আক্রান্ত-পরাজিতের সংজ্ঞা তৈরি হল দাস এবং দস্যু।এক পক্ষ ফরসা, লম্বা, নাক উঁচু এবং তাঁদের তুলনায় দাস-জনেরা কালো, বেঁটে, নাকে খাঁদা— কৃষ্ণত্বচঃ অনাসঃ— black and snub-nosed.

বেদের মধ্যে দাস-দস্যুদের ওপর দেবতা-ঋষিদের যে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য দেখেছি, ঠিক সেই ঘৃণাই রামায়ণে বর্ষিত হয়েছে বনচরদের ওপরে অথবা রাক্ষসদের ওপরে। কিন্তু বড়োই আশ্চর্য, অথচ ভীষণই অবহিত হওয়ার মতো ঘটনা এই যে, মহাভারতে আমরা যাঁদের বনবাসী হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের সকলেরই প্রায় একটা রাজনৈতিক সংজ্ঞা তৈরি হয়ে গেছে, এমনকি তাঁদের অনেকের একটা ভৌগোলিক অবস্থানও আছে এবং তা বনবাসীর নিজস্ব ভূখণ্ড হিসেবেই আছে। রামায়ণেও

রাক্ষসরাজ রাবণ স্বর্ণলঙ্কায় বাস করেন, কিংবা বালী-সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজধানীতে। কিন্তু অহংকার, দম্ভ এবং লাম্পট্যের খানিক মিশেল ছাড়া তাঁদের বনচর-পদবি আমাদের গোচর হয় না, এমনকি সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তাঁরা আর্য-ভাষাভাষীদের থেকে খুব দূরে নন। কিন্তু মহাভারতে রাক্ষসও একবারে সঠিক অর্থে বনচর। পথিকের ধনপ্রাণ শেষ করার জন্য তারা গাছের ওপর অপেক্ষা করে। এঁদের মধ্যে এমন কোনো 'মিথিক্যালিটি' নেই, যাতে তাঁরা ভীষণভাবে বর্ণনীয় হয়ে উঠতে পারেন। মহাভারতের ভীম তাঁদের একজনকে মেরে ফেলতে পারেন, তেমনই তাঁরই বোন হিড়িম্বা রাক্ষসীকে বিয়েও করতে পারেন। এই সহজ ভাবের মধ্যেই মহাভারতে অশেষ বনচর মানুষদের আমরা নিজস্ব সংজ্ঞা এবং পরিচিতি বজায় রেখে চলতে দেখেছি।

বেদের কালে 'দাস' এবং 'দস্যু' প্রায় পরস্পর-পরিপূরক শব্দ। তারা আক্রান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লে বৈদিকদের সুখ হত (ঋগ্‌বেদ, ১.১৭৪.৭)। এই তথ্য মেনে নিয়েও বলি— যাঁদের ওপর তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আক্রমণের অস্ত্র নিয়ে, তাঁদেরও কিন্তু থাকার কতগুলি নির্দিষ্ট জায়গা ছিল এবং সেগুলি তাঁদের গ্রামও বটে অথবা তাঁদের শহর— দনো বিশ ইন্দ্র মৃঢ়বাচঃ সপ্ত যৎ পুরঃ (ঋগ্‌বেদ, ১.১৭৪.২)। কিন্তু তাঁদের গোষ্ঠীর নামে চিহ্নিত গ্রাম-শহরের সঠিক অবস্থিতি যতই অনুক্ত থাকুক, এই মন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বোধহয় 'মৃঢ়বাচঃ'। অর্থাৎ তাঁদের কথা বোঝা যায় না— unintelligible speech। ঋগ্‌বৈদিক দাস-দস্যুদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষণ 'মৃঢ়বাচঃ' শব্দটিকে পণ্ডিতজনেরা অনেকে বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে, এই শব্দেরই পরবর্তী পরিণতি হল 'ম্লেচ্ছ'। সংস্কৃতে 'ম্লেচ্ছ' প্রথমত একটি ক্রিয়াপদ, যার অর্থ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে না পারা, অপভাষণ করা। তবে এই শব্দ আগে ভাষার ব্যাপারে ব্যবহৃত হলেও পরে সেটা জাতি-নির্দেশ করেছে এবং তারও পরে তাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি নির্দেশ করেছে।

ম্লেচ্ছ শব্দটা ঋগ্‌বেদ কিংবা অথর্ববেদ কোথাওই পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রথম এই শব্দের সন্ধান মেলে সুপ্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে, যে গ্রন্থের রচনা-কাল খ্রিস্টপূর্ব আটশো শতাব্দী অন্তত। আর্য সংস্কৃত ভাষা ছাড়া দেশজ শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই সেটা অশুদ্ধির কক্ষে পড়ে গেছে। শতপথ বলেছে— ব্রাহ্মণ যেন অপউচ্চারণে ম্লেচ্ছদের মতো কথা না বলে, কেন-না তেমনটা বললে সেই বাক্যবন্ধের মধ্যে দেবতার কোনো ছায়া থাকে না— তস্মান্ ন ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছেদ, অসূর্যা হ্যৈষা বাক্। এই কথাটা এক্কেবারে প্রায় হুবহু নেমে এসেছে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। মহাভাষ্য লেখা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দেড়শো শতাব্দীতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময়ে। পতঞ্জলি লিখেছেন যে, পাণিনি-সূত্রগুলির ওপর ব্যাকৰণ-ভাষ্য লেখার অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হল— ব্রাহ্মণ যেন ভুল কথা না বলে, সে যেন অপভাষণ না করে। এই অপবভাষণ মানে আর্যদের নিজস্ব ভাষার বাইরে অন্য কোনো ভাষার কথা বলা, আর সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলিকে

ভুল উচ্চারণ করা, সেটা একেবারেই ম্লেচ্ছতা— তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছঃ হ বা এষ অপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূম ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

আমরা বলবো— এই হল প্রথম 'ডিসক্রিমিনেশন' যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন জনজাতিগুলিকে নিজেদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন, অর্থাৎ ভাষার পার্থক্য, আর এই ম্লেচ্ছ শব্দ এমনই এক ব্যাপ্ত বিশাল শব্দ, যার অর্থ শুধু আর অপভাষণের নীচতার মধ্যে আবদ্ধ রইল না, সেটা অন্য ভাষাভাষীর প্রতি অনাদরে পরিণত হল, এক সময় তার মানে দাঁড়াল নোংরা থাকা, তারপর ঘরদোর নোংরা, গায়ের রং কালো, খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্য, বন্যতা, এমনকি বাইরে থেকে-আসা আক্রমণকারী হুনদেরও বোঝানো হল এই ম্লেচ্ছ শব্দে— যেমনটি মুদ্রারাক্ষস নাটকের লেখক বুঝিয়েছেন তাঁর নাটকের ভরতবাক্যে— ম্লেচ্ছৈরুদ্‌বিজ্যমানা ভুজযুগম্ অধুনা...।

ইন্দো-আরিয়ান্ ভাষা-গোষ্ঠীর ব্যবহারে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে ম্লেচ্ছ-শব্দের একটা রূপ আছে, কিন্তু তার প্রাদেশিক অর্থগুলি আলাদা। কাশ্মীরি ম্লেচ্ছ-শব্দের রূপান্তর 'মিচ' নামে 'অহিন্দু' কিন্তু পাহাড়ি 'মলিচ' মানে 'নোংরা' পূর্ববঙ্গে আমার ছোটোবেলায় 'ম্যাল্লোচ' মানে যথেচ্ছাচারী নোংরা, পাঞ্জাবিতে ম্লেচ্ছ মানে কখনও 'মুসলমান' কখনও 'নোংরা' আবার কখনও 'খারাপ লোক'। প্রাচীন কালে খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলির প্রথম পর্যায়েই যখন বর্ণশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তখনই কিন্তু ম্লেচ্ছরা চতুর্বর্ণের বাইরে রয়ে গেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পরেও ত্রিবর্ণ-সেবার বশ্যতা নিয়ে শূদ্ররাও কিন্তু চতুর্বর্ণের বৃত্তমধ্যে স্থিত রয়ে গেলেন, কিন্তু এই বৃত্তের বাইরে যাঁরা, তাঁরা অপভাষাতেই কথা বলুন অথবা আর্য ভাষাতেই কথা বলুন, তাঁরা সব মনুর মতে চোর-ডাকাত ছাড়া কিছু নয়— ম্লেচ্ছবাচশ্চার্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।

কারণ, এটা তো ঠিকই যে, দিন যত গেছে ততই বর্ণসংকর ঘটেছে, ''ইন্টার মিক্সচার' ঘটেছে। রাক্ষস, দানব, দৈত্যরাও কেউ মহর্ষি কশ্যপের বংশধর অথবা পুলহ, পুলস্তের মতো মহামুনিদের ঔরস পুরুষ। তাঁরা যে সংস্কৃতের মতো দৈবীবাক্ জানবেন এটাই তো স্বাভাবিক। অতএব শতপথ ব্রাহ্মণ আর পতঞ্জলির অপভাষণের ম্লেচ্ছতা মনুর সময়েই উঠে গেল এবং স্মার্ত পণ্ডিতজনেরা পরিষ্কার বিধান দিয়ে বললেন যে, চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা যে-সব স্থানে নেই, সেই জায়গাটাই ম্লেচ্ছদের জায়গা, আর্যাবর্ত কিন্তু তার পরে— চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। তং স্মেচ্ছ-বিষয়ং প্রাহুঃ...। তার মানে ভাষা-টাষা নয়, চতুর্বর্ণের বাইরে হলেই ম্লেচ্ছ। কিন্তু দেখেছি, এই ব্যবস্থায় যদি চতুর্বর্ণের স্থিতিশীলতা দৃঢ় হয়ে থাকে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য অথবা সুরক্ষার জন্য তথাকথিত ম্লেচ্ছরাও এককাট্টা হয়েছেন। সোশিওলজিক্যালি এবং জিওগ্রাফিক্যালি তাঁদেরও একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে এবং

ভুল উচ্চারণ করা, সেটা একেবারেই ম্লেচ্ছতা— তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছঃ হ বা এষ অপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূম ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

আমরা বলবো— এই হল প্রথম 'ডিসক্রিমিনেশন' যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন জনজাতিগুলিকে নিজেদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন, অর্থাৎ ভাষার পার্থক্য, আর এই ম্লেচ্ছ শব্দ এমনই এক ব্যাপ্ত বিশাল শব্দ, যার অর্থ শুধু আর অপভাষণের নীচতার মধ্যে আবদ্ধ রইল না, সেটা অন্য ভাষাভাষীর প্রতি অনাদরে পরিণত হল, এক সময় তার মানে দাঁড়াল নোংরা থাকা, তারপর ঘরদোর নোংরা, গায়ের রং কালো, খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্য, বন্যতা, এমনকি বাইরে থেকে-আসা আক্রমণকারী হুনদেরও বোঝানো হল এই ম্লেচ্ছ শব্দে— যেমনটি মুদ্রারাক্ষস নাটকের লেখক বুঝিয়েছেন তাঁর নাটকের ভরতবাক্যে— ম্লেচ্ছৈরুদ্‌বিজ্যমানা ভুজযুগম্ অধুনা...।

ইন্দো-আরিয়ান্ ভাষা-গোষ্ঠীর ব্যবহারে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে ম্লেচ্ছ-শব্দের একটা রূপ আছে, কিন্তু তার প্রাদেশিক অর্থগুলি আলাদা। কাশ্মীরি ম্লেচ্ছ-শব্দের রূপান্তর 'মিচ' নামে 'অহিন্দু' কিন্তু পাহাড়ি 'মলিচ' মানে 'নোংরা' পূর্ববঙ্গে আমার ছোটোবেলায় 'ম্যাল্লোচ' মানে যথেচ্ছাচারী নোংরা, পাঞ্জাবিতে ম্লেচ্ছ মানে কখনও 'মুসলমান' কখনও 'নোংরা' আবার কখনও 'খারাপ লোক'। প্রাচীন কালে খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলির প্রথম পর্যায়েই যখন বর্ণশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তখনই কিন্তু ম্লেচ্ছরা চতুর্বর্ণের বাইরে রয়ে গেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পরেও ত্রিবর্ণ-সেবার বশ্যতা নিয়ে শূদ্ররাও কিন্তু চতুর্বর্ণের বৃত্তমধ্যে স্থিত রয়ে গেলেন, কিন্তু এই বৃত্তের বাইরে যাঁরা, তাঁরা অপভাষাতেই কথা বলুন অথবা আর্য ভাষাতেই কথা বলুন, তাঁরা সব মনুর মতে চোর-ডাকাত ছাড়া কিছু নয়— ম্লেচ্ছবাচশ্চার্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।

কারণ, এটা তো ঠিকই যে, দিন যত গেছে ততই বর্ণসংকর ঘটেছে, ''ইন্টার মিক্সচার' ঘটেছে। রাক্ষস, দানব, দৈত্যরাও কেউ মহর্ষি কশ্যপের বংশধর অথবা পুলহ, পুলস্তের মতো মহামুনিদের ঔরস পুরুষ। তাঁরা যে সংস্কৃতের মতো দৈবীবাক্ জানবেন এটাই তো স্বাভাবিক। অতএব শতপথ ব্রাহ্মণ আর পতঞ্জলির অপভাষণের ম্লেচ্ছতা মনুর সময়েই উঠে গেল এবং স্মার্ত পণ্ডিতজনেরা পরিষ্কার বিধান দিয়ে বললেন যে, চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা যে-সব স্থানে নেই, সেই জায়গাটাই ম্লেচ্ছদের জায়গা, আর্যাবর্ত কিন্তু তার পরে— চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। তং স্মেচ্ছ-বিষয়ং প্রাহুঃ...। তার মানে ভাষা-টাষা নয়, চতুর্বর্ণের বাইরে হলেই ম্লেচ্ছ। কিন্তু দেখেছি, এই ব্যবস্থায় যদি চতুর্বর্ণের স্থিতিশীলতা দৃঢ় হয়ে থাকে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য অথবা সুরক্ষার জন্য তথাকথিত ম্লেচ্ছরাও এককাট্টা হয়েছেন। সোশিওলজিক্যালি এবং জিওগ্রাফিক্যালি তাঁদেরও একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে এবং

তৈরি হয়েছে তাঁদের দেশ---- যদিও সেই দেশ সব সময়েই তৈরি হয়েছে আর্য-জনপদের প্রান্তভূমিতে, প্রান্তিক জায়গায় গ্রাম-শহরের প্রান্তিক বনভূমিতে।

একটা জনজাতি হিসাবে ম্লেচ্ছদের তৈরি হয়ে ওঠা, তাদেরও একটা 'জিওগ্রাফিক্যাল' জায়গা তৈরি হয়ে যাওয়া— এবং তারও প্রান্তিক বনদেশে— এই ঘটনাগুলি কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই ঘটে গেছে। কেন-না, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, যা কিনা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত বলেই নিরপেক্ষ গবেষকপণ্ডিতদের অনুমান— সেই অর্থশাস্ত্রে যে কোনো রাষ্ট্রের 'ফ্রন্টিয়ার রিজিয়ন' অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রান্তিক ভূমিতে যাঁদের বসবাস, তাঁদের সব সময়েই চোর, ম্লেচ্ছ এবং আটবিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে— এই প্রান্তিক জায়গাগুলি যে-কোনো রাষ্ট্রের চিরশত্রু বা 'নিত্যামিত্রদের' জায়গা— বহুদূর্গাশ্চোরগণৈঃ ম্লেচ্ছাটবীভি র্বা নিত্যাবিরহিতা প্রত্যন্তাঃ সা নিত্যামিত্রা।

অটবী মানে বন। আটবিক বনবাসী। অট্ ধাতুর অর্থ হেঁটে চলা, হেঁটে বেড়ানো। হাঁটা যায় এমন এমন গাছগাছালতিতে ভরা জায়গা, অথবা বন্যজন্তুরা যেখানে হাঁটে— আটন্তি অত্র, যদ্ধা অটন্তীতি অটাঃ। পশুরা এখানে হাঁটে, মানুষেরা হাঁটে। অতএব আটবিক কিন্তু অন্য এক প্রকারের মানুষ, যাঁরা আক্ষরিক অর্থে ম্লেচ্ছ না-ও হতে পারেন, আবার হতেও পারনে। কেন-না আর্যরা আর্যেতর ব্যক্তি সম্বন্ধে বেশি অর্থ ভাবতে পারেন না। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আটবিক তো অরণ্যবাসীদের জন্য একটি সাধারণ শব্দ। আক্ষরিক অর্থেই তাঁরা বনচর— সংগঠিত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেই সেখানে, কিন্তু সংগঠিত রাষ্ট্রের নায়ক বা রাজারা আটবিকদের বিশ্বাসও করেন না। করলে, চোর এবং ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আটবিকদের একত্র উচ্চারণ ঘটত না। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে আটবিকদের চিরকালীন শত্রু বা 'নিত্যামিত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।

কৌটিল্যের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রের 'ফ্রন্টিয়ার রিজিয়নে' যারা থাকে, তারা খুব নির্বিকার, নিশ্চেষ্ট এবং আগ-বাড়িয়ে গালে থাপ্পড় খাওয়া লোক নন। রাজ্যের প্রান্তভূমিতে নিজেদের মতো করে তাদের দূর্গ গড়ে ওঠে একের পর এক। এই 'সেটল্‌মেন্ট'-গুলোতে রাষ্ট্র তার প্রশাসন চালাতে পারে না। আমরা মহাভারতে দেখেছি— জতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবরা যখন নানা বন ঘুরতে-ঘুরতে একচক্রা নামে এক গ্রাম-শহরে এসে পৌঁছেছেন, তখন তাঁরা এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকার সময়ে বক-রাক্ষসের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। বক রাক্ষস গ্রাম-শহরে কাছাকাছি একটি বনে তাকে, তার ক্ষমতা এবং অত্যাচারের জেরে এই বনটা বক-রাক্ষসদের বন বা বক-বন নামেই পরিচিত— স তদন্নমুপাদায় গতো বকবনং প্রতি। তার মানে এটা তার 'সেটলমেন্ট', তার দুর্গ। এই বনে থেকেই সে তার নিকটবর্তী গ্রাম-শহর থেকে তোলা আদায় করে। এতটাই তার অত্যচারী প্রভাব যে, দেশের রাজাকে যে বিন্দুমাত্র

রেয়াত্ করেনা। একচক্রা-গ্রামে যে ব্রাহ্মণের ওপর বক-রাক্ষসের খাবার দেওয়ার পালা ছিল, তিনি অদ্ভুত একটা কথা কুন্তীকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন— এই দুর্বুদ্ধি বক-রাক্ষসের এমনই ক্ষমতা যে, আমাদের এই পুর-জনপদের আসল রাজা বনে গেছে। এই জনপদকে সেই রক্ষা করে— রক্ষত্যসুরবাড়্ নিত্যম্ ইমং জনপদং বলী— সে আছে বলে অন্য কোনো রাজ্য বা মানুষ থেকেও আমাদের ভয় নেই। আর আমাদের রাজা যিনি আছেন, তার প্রজা-রক্ষার ক্ষমতা নেই, বুদ্ধিও নেই। এমন উপায় তিনি করতে পারেন না যাতে মানুষ এখানে নিরুপদ্রবে বাস করতে পারে। এমন নিকৃষ্ট, দুর্বল রাজার আশ্রয়ে আমার মতো মানুষ যারা থাকে, তাদের বিপন্ন হবার নিত্য উদ্বেগ নিয়েই দিন কাটাতে হবে— বিষয়ে নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ কুরাজানমুপাশ্রতাঃ।

আমরা এই ক্ষুদ্র চিত্রটুকু মহাভারত থেকে তুলে ধরলাম এই জন্য যে, কৌটিল্যে আটবিক-ম্লেচ্ছ ইত্যাদি জনজাতির settlement বা 'বিষয়'গুলিকে বহুদূর্গ বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী দেশের রাজারও এখানে ঢোকার উপায় নেই। আর সেখানে ঢুকতে বা এইসব জনমনিষ্যিদের ঘাঁটাতে বারণও করেছেন কৌটিল্য। বলেছেন— খবরদার! খবরদার! এই ম্লেচ্ছ-আটবিকদের বাসস্থান প্রান্তিক বনভূমিগুলি যতই উর্বর এবং গুণসম্পন্ন হোক না কেন— নিত্যশত্রু যারা, তাদের যদি কোনো মতে নিজের অধিকারেও আনো, তাহলে অনেক শত্রু লাভ ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না— নিত্যামিত্রলাভে ভূষান্ শত্রুলাভো ভবতি। তা ছাড়া চিরকালীন এবং স্বাভাবিক শত্রুর চরিত্রটাই এমন যে, কৌটিল্য বলেছেন— তাদের উপকারই করো আর অপকারই করো তারা শত্রুই থেকে যায়, তারা শান্ত হয় না— নিত্যশ্চ শত্রুরূপকৃতে চাপকৃতে শত্রুরেব ভবতি।

কৌটিল্যের এই সত্যদৃষ্টি বোধহয় এখনও কাজ করে। একটা সম্পন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা দেখেছি যে, জঙ্গলমহল এবং পাহাড়ের জনজাতীর মানুষের কাছাকাছি আসা খুব কঠিন হয়। হয়তো বা এটাও ঠিক যে, প্রাচীন কালের রাষ্ট্রীয় সংস্কারটাই এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেখানে অরণ্যাচারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ঐতিহ্যগত রাষ্ট্রীয় শক্তির একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং বিরোধ-মূল থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ভাষাগত বাধা তো বটেই, কিন্তু তার সঙ্গে এই প্রান্তিক মানুষগুলির আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালী এবং খাদ্যাভ্যাস—এই সবকিছুর ওপরেই 'আচারবান্ বৈ পুরুষঃ' আর্যপুরুষের একটা চিরন্তন বিদ্বেষ বনচর মানুষদের অধিকতর এবং সগঠিতভাবেই প্রান্তিক করে তুলেছিল।

নইলে ভাবুন, বাল্মীকির মতন অমন স্নিগ্ধ মহাকবি তমসার নির্মল জলে স্নান করতে এসে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক লুব্ধক ব্যাধকে পক্ষী শিকার করতে দেখেই অমন একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসলেন— মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ—

কোনোকালে তুই মানুষের মধ্যে যশ-প্রতিষ্ঠা পাবি না, যেহেতু তুই এমন প্রিয়-মিলন-সুখের কালে ক্রৌঞ্চমিথুনের একতরফ মেরে ফেললি এইভাবে। আমরা বলব— নিষাদ ম্লেচ্ছদের যশ-প্রতিষ্ঠা তো এমনিই দিল না, দুই পক্ষীর মিলন-সুখ অব্যাহত রাখলেও ব্যাধের এই প্রতিষ্ঠা হত না। আর যদি এই কাজেই এমন অভিশাপ লাভ হয়, তবে মহাভারতের মহারাজ পাণ্ডুও তো প্রিয়মিলন মুহূর্তেই মৃগের ওপর শরবর্ষণ করেছিলেন এবং তাতে তাঁর পুত্রজন্মের প্রতিষেধ ঘটেছিল মাত্র, কিন্তু নিষাদ-ব্যাধের অপ্রতিষ্ঠার কালিমা তাঁর গায়ে লিপ্ত হয়নি।

আর এটা তো স্বাভাবিক যে, বনের মধ্যে বন্য জীবিকায় যাদের জীবিকা-জীবন নির্বাহ হয়, তারা পশুপক্ষী শিকার করেই ক্ষুধা নিবারণ করবে। এখানে সামান্যতম আশ্চর্যও নেই, এমনকি যে বাণাহত পক্ষীটির জন্য আদিকবির অভিশাপ নেমে এল ব্যাধের ওপর অথবা বেঁচে থাকা যে পাখিঠির আর্ত করুণ বিরহদীর্ণ চিৎকারে যে-মহাকবির শোক শেষপর্যন্ত শ্লোকে পরিণত হল— তাঁর আদর্শ নায়ক রামচন্দ্র কেন বনে গিয়ে বনের পশু, বনের পাখি ধরে আগুনের মিহি আঁচে 'পুটপাকে' রোস্ট করে খেতেন! আর এ-তো সামান্য কথা, বনচরদের নিজস্ব বসতিতে আর্য পুরুষদের প্রবেশ ব্যাপরাটাকে একজন বনচর ঠিক কীভাবে, কী চোখে দেখতেন, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাওয়া যাবে বাল্মীকি-রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে— রামচন্দ্র যেখানে সুগ্রীবের জন্য বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে বানররাজা বালীকে অন্যায় শরাঘাতে ধরাশায়ী করে ফেলেছেন।

বালী আহত অবস্থাতেও রামচন্দ্রকে কথা শোনাতে ছাড়লেন না। বললেন— আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি ভদ্রলোক, অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তুমি কখনোই আমাকে শরাঘাত করবে না— ন মাম অন্যেন সংরব্ধ প্রমত্তং বেদ্ধমর্হসি— অথচ তুমি তাই করলে। তুমি কেমন ক্ষত্রিয়? কেমন বীর? আমরা গাছের ফলমূল খাই, বনের মধ্যে থাকি, তোমার রাজ্যে বা নগরে আমি যাইনি অথবা সেখানে কোনো ক্ষতিও করে আসিনি, তোমাকেও কোনো কারণে অপমানও করিনি, তাহলে এমন নিরাপরাধ একটা মানুষকে তুমি হত্যা করলে কেন— ন চ ত্বামবজানেহং কস্মাত্ত্বং হংস্যকিল্বিষম্? বালী আরও বললেন— আমাদের বন, আমাদের সম্পত্তি ফল-মূল— এসব জিনিসে তো তোমাদের লোভ থাকার কথা নয় জমি-জায়গার ব্যাপার হত, সোনা-রূপোর ব্যাপার হত, তাহলে বুঝতাম যে, সেগুলি তোমাদের মতো রাজপুরুষদের কাছে বিবাদ-বিসংবাদের কারণ হয়ে ওঠে, কিন্তু আমাদের তো সে-সব কিছুই নেই, তাহলে এই বনের ওপর, আমাদের ফল-মূলের ওপর এত আক্রোশ কীসের— তত্র কস্তে বনে লোভো মদীরেষু ফলেষু বা।

বানররাজ বালী এটা বোঝেনি যে, লোভটা তো আর বন আর ফলের ওপর নয়,

লোভটা বীরদর্পিত নাগরক-সমাজের আগ্রাসনী বৃদ্ধির মধ্যে নিহিত। এ-কথা প্রত্যেকে স্বীকার করেন যে, রামচন্দ্র বালীবধ করে অন্যায় কর্ম করেছেন এবং এটা তাঁর মহান চরিত্রে একটা কলঙ্ক বটে। কিন্তু তার চেয়েও অন্যায়কর তাঁর বালীবধের যুক্তিগুলি। বস্তুত যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে খুব দুর্বল এবং 'নট্-আপ-টু দ্যা-পয়েন্ট' হলেও সেগুলিই বনচর মানুষগুলির সঙ্গে নাগরক রাজপুরুষের সহবাস পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসার যুক্তি। রামচন্দ্র বালীকে বিনা যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন— পর্বত, বন, কানন যত আছে সবই আমাদের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত— ইক্ষ্বাকুনাম্ ইয়ং ভূমিঃ সশৈল-বন-কাননা। সেই ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজারা— এইসব জায়গার মৃগ-পক্ষী এবং মানুষদের ওপর অনুগ্রহও দেখাতে পারে, আবার তাদের নিগ্রহও করতে পারে— মৃগ-পক্ষী-মনুষ্যানাং নিগ্রহানুগরহেষ্বপি।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়— কবে যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা— দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথেররা কিষ্কিন্ধ্যার অধিকার গ্রহণ করেছিলেন, কেউ জানে না। অবশ্য শুধু অযোধ্যা, কিংবা শুধু কাশী-কোশল, কিংবা শুধুই হস্তিনাপুরীর রাজা হয়েও নিজেদের পৃথিবীর রাজা অথবা সসাগরা ভারতভূমির রাজা বলে ঘোষণা করাটা সে-যুগের রেওয়াজ ছিল। এবং এই মোতাবেক রামচন্দ্র বলেছেন— আমার ভাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভরত এখন এই পৃথিবীর রাজা। আমি তাঁর আদেশ অনুসারেই শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দণ্ড বিধান করছি— ভারতাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিন্তয়ামো যথাবিধি। আমরা খুব ভালো জানি যে, কিষ্কিন্ধ্যার বালীকে নিয়ে ভারতের সঙ্গে রামচন্দ্রের একটি কথাও হয়নি, পূর্বালোচনা তো নয়-ই। তবে হ্যাঁ, রাজার প্রতিনিধি হিসেবে অন্যায় দমন করার নীতিগত অধিকার আছে। কিন্তু যে অন্যায়ের কথা তিনি বলেছেন, সেও তো বড়ো পাক্ষিক বিচার। তিনি বলছেন— তুমি সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে তোমার পুত্রবধুতুল্যা ছোটোভাইয়ের স্ত্রীকে তুমি উপভোগ করেছো— ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়া ত্বক্ত্বা ধর্মাং সনাতনম্।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়— অতি-আপন আর্য সনাতন ধর্মের উপদেশ তিনি বনারণ্যচারী মানুষকে পরিবেশন করছেন কেন? আর যদি সেটা করারই প্রয়োজন অনুভব করে থাকেন, তাহলে বলবো— এ তাঁর কেমন বিচার! তাঁর বন্ধু সুগ্রীব, যাঁর কথা শুনে তিনি বালীকে মারলেন, সেই সুগ্রীব তো তাঁরই সংজ্ঞা অনুযায়ী মাতৃসমা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর অঙ্কশায়িনী হয়েছেন পূর্বে। সুগ্রীব যে-কথা বন্ধুর কাছে লুকিয়ে গেছেন, অথচ ইক্ষ্বাকু রাজাদের ধর্মপ্রণিধি রামচন্দ্র সেটা যাচাই করেও দেখেননি। এখন তিনি আর্যীকরণের বুদ্দিতে এক বনচরকে মেরে ফেলার পর তাঁকে সনাতন ধর্মের উপদেশ দিচ্ছেন, যা বনচরের লৌকিকতায় খুব কিছু অন্যায় অধর্ম নয়। কেন-না, বনচর মানুষ্যকূলের মধ্যে কামনার সূত্রগুলি অনেক শিথিল, সেখানে সনাতন ধর্মের সদুপদেশ চলেনা। কিন্তু এই আর্যীকরণের চাইতেও বড়ো সমস্যা হল অরণ্যের এবং আরণ্যক

মানুষের প্রতি নাগরিক রাষ্ট্রশক্তির 'অ্যাটিটিউড', যা রামায়ণের কাল পর্যন্ত অবিশ্বাস, সংশয়, ঘৃণা এবং বিদ্বেষে ভরা।

এই বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং অবিশ্বাস অথচ তাঁদের স্বাতন্ত্র্যই হয়তো চতুর্বর্ণের বহিঃস্থিত জনজাতিগুলিকে এতটাই পৃথক করে দিল যে, তাঁরা আর্য-সংজ্ঞায় চিহ্নিত রাষ্ট্র-জনপদের বাইরে এক প্রান্তিক জগতের অধিবাসী হয়ে উঠলেন। তাঁদের বসতি গড়ে উঠল বনে, পাহাড়ে, জঙ্গলে— পরবর্তী কালের পৌরাণিকেরা তাঁদের ঠিকানা-নির্দেশই করেছেন এইভাবে— গিরি-কানন-গোচরাঃ। কালক্রমেই এই প্রান্তিক জাতিগুলির নাম হল এবং যাঁদের নামকরণ করা গেল না, তখনও তাঁদের সাধারণ নাম রইল ম্লেচ্ছ—

নিষাদাশ্চ কিরাতশ্চ ভিল্লা নাহকাস্তথা।
ভ্রমরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

তবে এই নামগুলিই মাত্র, সঠিক কোনো 'লিস্ট' নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্র-জনপদের প্রান্তদেশেই এঁরা ছিলেন, দেশ-ভাষা-জলবায়ু এই প্রান্তিক অরণ্যচারী জনজাতির আকৃতি এবং প্রকৃতিতে যেমন ইতর বিশেষ ছিল, তেমনই মৌল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কও ছিল বিচিত্র রকম। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিপুল সময় ধরে এই সব জনজাতির কিছু কিছু আর্যায়ণ যেমন ঘটেছে, তেমনই রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাজতন্ত্রের সুস্থিত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে বনবাসী অরণ্যাচারীদের প্রতি আর্য-জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিও পালটেছে। বনরণ্যাচারীরা সংখ্যায় কম ছিলেন না এবং শূদ্রবর্ণের মতো আর্যদের সেবা-শুশ্রূষা করে এঁরা কখনও দাসে পরিণত হননি। তাঁদের পৃথক আচার, পৃথক খাদ্যাভ্যাস এবং অতি পৃথক এক অরণ্য কৃষ্টি আত্মসাৎ করেই নিজেদের কালচার গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা।

আর্য জনজাতির মানুষেরা এঁদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন বারবার, কিন্তু নিঃশেষে ধ্বংস করতে পারেননি কখনও। পণ্ডিতজনেরা নিষাদদের প্রসঙ্গে একবার লিখেছেন— The Nishada-s were too numerous to be anmihilated and too powerful to be enslaved or expelled en masse. মহাভারতে তো দেখেছি— আর্য জনপদের প্রান্তিক বনদেশে নিষাদগোষ্ঠীর পৃথক রাষ্ট্রই আছে এবং সেখানে নিষাদরাজা হিরণ্যধনুর ছেলে একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিতে হয়েছে অন্যায়ভাবে এবং তা আর্য জনজাতির সংস্থিতির জন্য। অন্তত অর্জুনের মতো মহাপরাক্রমী বীর একলব্য নৈষাদিকে আপন প্রতিদ্বিন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিয়েছেন সুকৌশলে— গুরুকৃপা সম্বল করে। আসলে নিষাদ, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, কিরাত— এই রকম কয়েকটি শব্দ ভারতবর্ষের নিখিল অরণ্যচারী মানুষের প্রতিভূস্থানীয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ এইগুলিই বিভিন্ন অরণ্যচারী গোষ্ঠীর সাধারণ নামে পরিণত। আর্য় জনগোষ্ঠী এঁদের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা নিয়ে জন্মালেও, এমনকি তাঁরা 'কালচারালি' বিচ্ছিন্ন থেকেও এঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

রেখে গেছেন রাজনৈতিক কারণে। অপিচ বিচ্ছিন্নতা বজায় রেখেও নিজেদের প্রয়োজনে এই আরণ্যক জনজাতিকে ব্যবহারও করেছেন। মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থগুলিতেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আটবিক জাতির নাম পাওয়া যাবে, যাঁদের প্রাধনত যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্ত্যজ ম্লেচ্ছদের মধ্যে বেশ কিছু occupational groups অবশ্য নিজেদের দ্বার্থেই তৈরি করেছিলেন রাজারা— তাঁরা গ্রাম প্রান্তে থাকতেন। তাঁরা ঠিক বনচারীও নন, আবার গ্রামের ভিতরেও তাদের জায়গা নেই। মরা-পোড়ানো, ফাঁসিতে চড়ানো ইত্যাদি প্রতীতিকর কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে তাঁরা প্রায় অস্পৃশ্য ছিলেন, কিন্তু সেই দিক থেকে বনচারীরা কোনো অর্থে অস্পৃশ্য ছিলেন না— রাজারা তাদের ব্যবহার করতেন যুদ্ধকর্মে, সম্ভত মার্সেনারি হিবে। কিন্তু আর্য রাজারা তাঁদের কোনো কালে বিশ্বাস করেননি, তেমন মর্যাদও দেননি কখনও। রামায়ণ-মহাকাব্যে এই ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট করে বোঝাই যায় না, কিন্তু মহাভারতে এটা খুব পরিস্কার দেখছি যে, আটবিক জনসাধারণের সঙ্গে মহাভারতীয় রাজারা যথেষ্ট উদার সম্পর্ক রাখছেন। আটবিক রাজাদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে যুদ্ধও হয়েছে বটে, কিন্তু রাজসূয যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁরা সবাই আমন্ত্রণ-নিয়ন্ত্রণও লাভ করেছেন। লক্ষ্যণীয় কিন্তু এটাই যে আটবিক প্রধানেরা, যাঁরা প্রচুর-প্রচুর উপহার-উপঢৌকন নিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজবাড়িতে এসেছেন যজ্ঞ-সমাপ্তির উৎসবে যোগ দেবার জন্য, তাঁরা কিন্তু রাজবাড়ির দ্বারপ্রান্তে এসেই বাধা পাচ্ছে, তারা সোজাসুজি ভিতরে ঢুকতে পারছে না। মহাভারত বলছে— বৈরাম, পারদ, আভীর এবং কিতব জনজাতির মানুষেরা সমুদ্রের তীরবাসী মানুষ, তারা বহু রত্ন, ছাগল, ভেড়া, গোরু, গাধা, উট, মদ্য এবং কম্বল নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু দ্বারপালরা তাদের ঢুকতে না দিলে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল তারা— দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ।

এই বর্ণনা দিচ্ছে দুর্যোধন, যিনি দোষদর্শী চিত্তে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-মহারোহ দেখে আপাতত ভীষণ ঈর্ষা-অসূয়ায় ভুগছেন। তিনি দেখেছেন— প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত, যিনি ম্লেচ্ছদের অধিপতি বলে পরিচিত, তিনি যবনদের সঙ্গে রাজদ্বারে উপস্থিত হলে তাঁকেও বারণ করা হল— যবনৈঃ সহিতো রাজা... ম্লেচ্ছানামধিপো বলী। তাঁকে সামান্য সময় আটকে রাখলেও পুরাণ-প্রসিদ্ধ প্রাগ্‌জ্যোষিপুরের রাজা বলেই তিনি কিন্তু ভিতরে ঢোকার 'চান্স' পেলেন এবং তিনি একটি হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা তলোয়ার উপহার দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। এটা অবশ্য বুঝতে পারি যে, অসংখ্য মানুষদের দ্বারপালেরা আটকে রাখছে বাইরে— প্রায় ধ্রুবপদের মতো ব্যবহৃত এই শব্দটি— দ্বারি তিষ্ঠতি বারিতাঃ— এই বাক্যের তাৎপর্য এক অর্থে এটই যে, যুধিষ্ঠিরের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের জন্য যাঁরা আসছেন এবং এসেছেন তাঁদের ভিড় সামলানো যাচ্ছে না বলেই তাঁদের অনেককে আটকে রাখতে হচ্ছে দুয়োরেই বাইরেই।

কিন্তু এরই মধ্যে তো আবার মানুষ বুঝে কাউকে কাউকে ছেড়েও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দ্বারে বারিত করার উদাহরণে বেশির ভাগই কিন্তু আটবিক জনজাতির মানুষ— আর্যজনেরা তঁদের মন থেকে পছন্দ করছেন না বলেই দুর্যোধনের চোখে তাঁদের চেহারাও বিকৃত। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন— আমি দেখলাম— দ্বিনয়ন, ত্রিনয়ন, ললাটচক্ষু, উষ্ণীষধারী, বস্ত্রহীন, সারা গায়ে লোম, মানুষের মাংস খায় এবং এক পায়ে চলতে পারে এমন সব লোকেরা এসেছে, কিন্তু ঢুকতে পারেনি তারাও— অপশ্যং দ্বারি বারিতান্। তারপর দেখলাম— বাহ্লীক দেশের রাজা, পারসিক দেশের রাজা, চিন, শক, উদ্র, বর্বর, বন্য, বার্ষ্ণেয়, হারহূন, এবং হিমালয়ে থাকে, অথচ বেশ কালো— এদেরও সবাইকে আটকে দেওয়া হল দ্বারেই— বিবিষান্ দ্বারবারিতান্। কিন্তু এই সব উপজাতি, গোষ্ঠীর রাজারা যে-সব বস্তু উপহারের জন্য নিয়ে এসেছেন, তার মান থেকে প্রমাণ হয় যে, অনন্ত মহাভারতের কালে তাঁরা তাঁদের মতো এক-একটি সম্পন্ন জগতের অধিবাসী; তাঁদের নিজস্ব ভূমি ছিল এবং সেখানে তাঁদের স্বশাসন ছিল। তাঁদের সংখ্যাও অনেক। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল— আপন প্রয়োজন এবং অর্থসিদ্ধির জন্য এইসব আটবিক জনজাতিকে রাজ্যের প্রান্তদেশে থাকতে বাধ্য করলেও আর্য রাজারা তাঁদের রাজনৈতিক বশ্যে পরিণত করতে পারেননি। ফলত নিজেদের কারণেই তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয়েছে।

এই ভাবার কোনো কারণ নেই যে, শুধুমাত্র বিন্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণ দিকটাতেই অটবিক ম্লেচ্ছদের বসবাস, কেন-না আর্যরা প্রথম-দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই জায়গাটা পর্যন্তই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তারপর গঙ্গানদীর দুই তীর ধরে একেবারে যখন সদানীরা নদীর কাছে দ্বারবঙ্গ-দ্বারভাঙা পর্যন্ত চলে এলেন তখন আবারাও আটবিকদের নতুন নতুন ঠিকানা খুঁজতে হয়েছে। কেন-না আর্যায়ণের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকায়, সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই বন-অরণ্যপ্রদেশের নগরায়ণ ঘটিয়ে ফেলেছে। ফলত আবারও আটবিকদের সরতে হয়েছে প্রান্তিক স্থানে। লক্ষ্যণীয়, রাজসূয় যজ্ঞের আগে যে দিগ্‌বিজয়-পর্ব চলেছিল, তাতে তাঁর ভাই উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চার দিকেই ম্লেচ্ছ-আটবিকদের দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁদের জয়ও করতে আসতে হয়েছিল। তাতেই বোঝা যায় যে, আটবিকের সর্বত্রই ছিলেন এবং তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য-অধ্যুষিত রাষ্ট্রের প্রান্তভাগেই। কিন্তু মহাভারতের যুগে তাঁদের সঙ্গে আর্য রাজাদের সুসম্পর্ক ছিল।

রাজসূয়ের প্রাক্‌কালে অর্জুন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ভগদত্তের সেনাবাহিনীতে কিরাত, চিন এবং সমুদ্রতীরবাসী অন্যান্য সৈন্যরা ছিলেন অর্জুনের উত্তর-জয়ের লিস্টে পার্বতীয়রা আছেন, আছেন পর্বতবাসী দস্যুরাও— বিজিতা চাহবে শূরান্ পার্বতীয়ান্ মহারথান্। পর্বতের সানুদেশ থাকেন বলেই এঁরা দস্যু, বিশেষত পাহাড়ে খাবার অনেক সময়েই অপ্রতুল বলে এঁরা

পর্বতান্তিক সমতলে হানা দিতেন, অতএব দস্যু। এই দস্যুদের সঙ্গেই কিন্তু নাম করা হয়েছে বাহ্লীকদেশ, কাম্বোজ দেশ, দারদ দেশ, ঈশান কেণে থাকা দস্যুদেরও— এরা প্রত্যেকে আর্যাচার বহির্ভূত জনজাতি। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের আটবিক বলতে মন না চাইলেও এঁরা বৃহদর্থে আটবিকই বটে। ভীম যখন পূর্বদেশ জয় করতে গেছেন রাজসূযের প্রাক্কালে সেখানে সাতজন কিরাত রাজাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি— কিরাতানামধিপতীন্ অজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ। পুনরায় দেখতে পাচ্ছি এক দরদ জনজাতিকে— দারদাংশ্চ মহাবলান্। সুহ্ম, বঙ্গ, পৌণ্ড্রদেশও তখন আর্যাচার-বহির্ভূত দেশ বটে, কিন্তু তাঁরা আটবিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা উচ্চারিত হলেন পূর্বসমুদ্রনিবাসী ম্লেচ্ছবধের সঙ্গে — স সর্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।

সহদেব দক্ষিণ-দেশ জয় করতে ব্রগিয়ে বিদর্ভ-জয়ের পরেই কতগুলি আরণ্যক জনজাতির নাম পাওয়া যাচ্ছে— কান্তারক, প্রাকোটক, নাটকেয়, হেরম্ভক, মারুধ, রম্যগ্রাম, নাচীন, অর্বূক ইত্যাদি— তাংস্তান্ আটবিকান্ সর্বান্ অজয়ৎ পাণ্ডুনন্দনঃ। স্বাভাবিক কারণেই এবং সে-কারণ আমরা জানি— দক্ষিণের বিস্তীর্ণ প্রদেশে আর্যায়ণের প্রতিষ্ঠিত চেহারা দেখার আগেই আর্যায়ণের গতি পূর্ব-দেশের গতিপথ করেছে পুণ্যতোয়া গঙ্গার আনুপথিকতায়। ফলত সহদেবের দক্ষিণ-দিগ্‌বিজয়ে অনেকগুলি অরণ্য-বসতির সন্ধান মিলছে— শূর্পারক, তালীকট নগরের রাজা, দণ্ডকারণ্যের রাজা, সাগর-দ্বীপবাসী, ম্লেচ্ছরাজগণ, নিষাদ, পুরুষাদ রাক্ষস, কর্ণপ্রাবরক, রাক্ষসীর গর্ভজাত কালমুখ জনজাতি এবং কোলদের পর্বতবসতি। এই দক্ষিণ-দেশেই কতগুলো জায়গায় সহদেব যেতেই পারেননি, যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করার জন্য তিনি দূত পাঠিয়েছেন বনবাসী কেরলদের কাছে— কেরলান্ বনবাসিনঃ— তারপর সঞ্জয়ন্তী নগরী, পাষণ্ডদের দেশ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, তালবনদেশ, উষ্ট্রিককর্ণ মনোহর আটবীপুর এবং যবনপুরী জয় করলেন তিনি। সহদেবের দাদা নকুল অবল্য পশ্চিমে যাঁদের জয় করেছেন, তাঁরা অনেকেই একটু ভারত-বহির্ভূত গোছের— রামঠ, হারহূন, পহ্লব, বর্বর এবং কিরাত-যবন-শক আমাদের চেনা।

মহাভারতে পাওয়া এই সব বহুতর জনগোষ্ঠী, যাঁদের অনেকেই আটবিক শ্রেণির, তাঁদের অনেকেরই একটি ঐতিহাসিক সংজ্ঞা তৈরি করা যায়, কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধে এটাই জরুরি কথা যে, মহাভারতে এই সব আটবিক জনজাতির এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবহারিকতা আছে। আমরা বলতে চাই— মহাভারতের আমলে যে-সমস্ত আটবিক গোষ্ঠীকে আমরা ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে ওঠবোস করতে দেখেছি, তাঁদের এই সৌহার্দ্য-পর্ব একদিকে যেমন আটবিক-জনের সম্পন্নতার ইঙ্গিত দেয়, তেমনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিহার্যতারও ইঙ্গিতবহ। ষোড়শ মহাজনপদের প্রতিষ্ঠার কালকে যদি ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনাতে ভাবি, তাহলে এই সব আটবিক গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিকতাও সেই কালেই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া

যায়। তবে হ্যাঁ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আর্য ক্ষত্রিয়দের নির্দিষ্ট আধিপত্য এবং নির্দিষ্ট জনপদ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বনচারীদের যতই প্রত্যন্ত ভূমিতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সংঘর্ষের পথটাও কিন্তু ততই প্রশস্ত হচ্ছিল। অশোকের মতো রাজা, যিনি যুদ্ধ-বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের মাধ্যমে সমস্ত ভারতীয় জনপদকে আত্মানুকূল ভাবেই একত্রে করেছিলেন, তিনিও কিন্তু আটবিক জনজাতিকে এইভাবে বাগ মানাতে পারেননি বলে মনে হয়। আটবিকদের উদ্দেশ্যে পৃথক এক অনুশাসন জারি করে তাঁকে বলতে হয়েছে— দেবানাং পিয় পিয়দশ্‌শি, রাজা অশোক তাঁর রাজ্যের প্রান্তবাসী বনচর জাতিকূলকে মানিয়ে নিচ্ছেন বা তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলছেন বটে, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী এটাই যে, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাঁর সমস্ত অনুতাপ এবং ধর্মানুভূতির মধেও তিনি কিন্তু অসীম শক্তিধর। অশোক বলছেন— আটবিকরাও তাঁর ধর্মবিজয় মেনে নিক, যাতে তাঁদের মরতে না হয় শেষপর্যন্ত।

অশোকের এই অনুশাসনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল— আলাপ-আলোচনা-অনুশাসন ব্যর্থ হলে অথবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে অতি-শান্ত গণতান্ত্রিক রাজাও যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করবেন, এটাও তাই। অশোকের এই অনুশাসনের আটবিক বলতে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরা হলেন যোন, কাম্বোজ, নাভক, ভোজ, পিতিনিক, আন্ধ্র এবং পালিদ (পুলিন্দ)। অশোক এইসব জনজাতিকে তাঁর 'রাজবিষয়ে'র মধ্যে 'বিজিত' বলে নির্দেশ করল হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির মতো প্রামাণিক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এইসব আটবিকেরা স্ব-স্বক্ষেত্রে স্বাধীন রাষ্ট্রের মতোই মাহাত্ম্য ভোগ করতেন এবং একটি প্রতিষ্ঠিত এবং ঘোষিত রাষ্ট্রের প্রান্তে থেকেও নিজেদের অবিজিত ভাবটাই বজায় রাখতেন— a status midway between the provinces and the unsubdueed borderers.

অশোক তো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতব্দীর লোক। তাঁর সময়ে আটবিকদের প্রতি যে অবিশ্বাস এবং সেই হেতু সামান্য ক্রোধও সূচিত হয়েছে, তার প্রাতিষ্ঠানিক এবং শোষিত চেহারাটা ধরা পড়ে অশোকের পিতামহের কাল থেকে— চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধামন্ত্রী বলে কথিক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের নিশ্চিত সূচনা থেকে। কৌটিল্য লিখেছেন— রাজা নিজ রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশের চতুর্দিক কয়েকটি অন্তপাল-দূর্গ নির্মাণ করবেন। অন্তপাল-দূর্গগুলি আসলে এক রনের চেক্-পোস্ট। জনপদ-রক্ষায় সমর্থ এই সব চেক-পোস্টগুলিতে জনপদ মানুষের ঢোকা ও বেরোনোর দ্বার থাকবে। এইই রকম দুটি দূর্গের অন্তর্বর্তী স্থানে থাকবে বাগুরিক (ব্যাধ), শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল এবং অন্যান্য অরণ্যচর জাতির লোকেরা। এইখানে থেকেই তারা জনপদের মানুষকে নানাভাবে রক্ষা করবে, অর্থাৎ কিনা তারা এইখানে পাহারাদারি করবে— তেষাম্ অন্তরাণি বাগুরিক-শবর-পুলিন্দ-চণ্ডালারণ্যচরা রক্ষেযু।

রাজ্যপ্রান্ত-সুরক্ষায় এইরকম অন্তপাল বসিয়ে রাখলেও মূল রাজকীয় কর্ম থেকে এঁরা দূরে থাকায় মূল রাজকীয় প্রশসানের সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গতা তৈরি হত না কখনও। ফলে এঁরা নিজের মতো করেই নিজেদের তৈরি করতেন এবং আটবিক জনের অস্ত্রক্ষমতা এবং কূটকৌশল চিরকালই বিখ্যাত বলে স্বক্ষেত্রে এঁদের পরাজিত করাটা যে-কোনো রাজার পক্ষেই কষ্টসাধ্য ছিল। বল, কৌশল এবং প্রশাসনিক দূরত্ব একত্রিত হওয়ায় আটবিক অরণ্যচারী গোষ্ঠীর লোকেরা অনেক সময়েই মূল ভূখণ্ডে কিছু কিছু উপদ্রব চালাত এবং সেই চিত্রটা রামায়ণ-মহাভারতের রাক্ষস-ব্যবহারে যেমন প্রতিফলিত, তেমনই সেটা সংক্রমিত হয়েছে আটবিকদের চরিত্রে। অথচ এই চোরাগেপ্তা উপদ্রব ব্যবস্থিত রাজাদের পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। এমনটা যদি না ঘটতে তাহলে কৌটিল্য লিখতেন না যে, রাজা যদি দেখেন— তাঁর রাষ্ট্র শত্রুর কপটতা বা শত্রুসৈন্যের দ্বারা উপদ্রুত হয়েছে অথবা অন্তপালদের দ্বারা উপদ্রুত হয়েছে, তাহলে রাজা উপদ্রুত এলাকার প্রজাদের কর ছাড় দেবেন—

পাদচক্রাটবীগ্রস্তং ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-পীড়িতম্।
দেশাং পরিহরেদ্ রাজা ব্যয়ক্রীড়াশ্চ বর্জয়েৎ।

আটবিকদের দ্বারা উপদ্রুত এলাকায় কর ছাড় দেওয়ার অর্থ এই যে, উপদ্রবের ব্যাপারে রাজা কিছুই করতে পারছেন না বলেই উপদ্রুত প্রজাদের কর ছাড় দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া বা শান্ত করা।

আমরা যে এত করে কৌটিল্যের প্রমাণ দিচ্ছি তার একটা বড়ো কারণ হল— ইংরেজিতে যাকে 'স্টেট ফরমেশন' বলে, সেটা যেমন মহাভারতের আমলে তৈরি হয়ে গেছে, এমনকি তৈরি হয়ে গেছে রাষ্ট্রের একটা প্রায়-বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাও, সেখানে কৌটিল্যে সেটা আরও পরিণত রূপ ধারণ করেছে। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বনচর আটবিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম ছিল, সেটা কৌটিল্য থেকে মহাভারতেরটা আন্দাজ করা যায়। কৌটিল্যের কালে সৈন্যবাহিনীর যে গঠন ছিল, তাতে পাঁচ-ছয় রকমের সৈন্য 'রিক্রুট' করা হত— ১. মৌল বল অর্থাৎ বংশপরম্পরায় রাজসেবী সৈন্য, যাঁরা সববচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত। রাজার প্রতি অনুরাগ এবং রাজ্যের প্রতি মমত্ব— এই দুটির কারণে সবচেয়ে বিশ্বস্ত 'গ্র্যান্ড আর্মি' হল মৌল বল। ২. ভূতক বল, অর্থাৎ যাঁরা মাইনের বিনিময়ে সৈন্যের চাকরি করতে আসেন। প্রধানত যুদ্ধের সময় সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্য সাময়িকভাবে বেতন দিয়ে যে-সব সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, তাঁরাই 'ভূতক'। ৩. শ্রেণি-বল, অর্থাৎ 'গিল্ড্' থেকে পাওয়া সৈন্য। ৪. মিত্রব, অর্থাৎ বন্ধু-রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া সৈন্য। ৫. শত্রুবল, অর্থাৎ সন্ধির মাধ্যমে, দণ্ডের মাধ্যমে অবা ভেদনীতির মাধ্যম যে-সমস্ত সৈন্যকে রাজা শত্রুরাজ্য থেকে আত্মসাৎ করেন। ৬. অবশিষ্ট হল আটবিক বল, অর্থাৎ রাজ্যের অন্তর্গত পর্বত এবং অরণ্যবহুল অঞ্চলগুলি থেকে রাজার সাহায্যের জন্য পার্বত্য এবং আরণ্যক জনকে সৈন্য হিসেবে নেওয়া।

আটবিক পুরুষেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেকে খুব ভালো জানতেন। জীবন এবং জীবিকার জন্যই অস্ত্রকুশল হয়ে ওঠার ফলে রাজার সৈন্যবাহিনীতে তাঁদের ডাক পড়ত। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের মধ্যে যে তথ্য আমরা পাচ্ছি, তাতে এটা বোঝায় যে, আটবিক সৈন্য সংগ্রহ করাটা একেবারেই রাজার ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিষয়। কৌটিল্যের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম মৌল প্রকারের সৈন্যদলের ওপর রাজার অনুরাগ থাকত পরম্পরাগত বিশ্বাসের কারণেই। তারপরের তিনটিকে তিনি বিশ্বাস করতেন, বাধ্য হতেন। কিন্তু শত্রুবল এবং আটবিক বলকে তিনি কখনই বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁদের অন্যায় ক্ষেত্র ব্যবহার করতেন। স্বয়ং কৌটিল্য নির্দেশ দিচ্ছেন— অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হলে বিজিগীষু রাজা শত্রুরাজ্য থেকে সংগৃহীত দণ্ডোপনত শত্রুসৈন্যদের যুদ্ধ করতে পাঠাবেন অথবা পাঠাবেন আটবিক সৈন্যদের।

তাতে সুবিধা কী? কৌটিল্য উত্তর দিচ্ছেন কুকুর-ভোজী চণ্ডালের উপমা দিয়ে। বলছেন— দাঁতালো শুয়োর ধরার জন্য চণ্ডাল কুকুর নিয়েই বনে শিকার করতে যায়; তারপর শিকারের মুহূর্তে সে কুকুর আর শুয়োরের লড়াই লাগিয়ে দেয়— তাতে যেটাই মারা যাক, চণ্ডালের অসুবিধে নেই, বরঞ্চ লাভ, কারণ, সে কুকুর খায়, শুয়োর তো খায়ই— তত্র মে শ্ববরাহয়োঃ কলহে চণ্ডালস্যৈব অন্যতরসিদ্ধিঃ ভবিষ্যতি। তার মানে, আক্রমণ করে যে রাজাকে নিজের বশংবদ করেছেন, শত্রুরাজ্যের সেই সৈন্য এবং আটবিক সৈন্য— দুটোকেই তিনি আসলে উচ্ছিন্ন করতে চান, কেন-না তাতে শত্রুর শক্তি হ্রাস পাবে, এবং আটবিকদের মাত্রাছাড়া তেজও সেখানে বড়ো ধাক্কা খাবে— রাজা এই দুই পক্ষকেই শেষ পর্যন্ত ক্ষয় করতে চান।

কৌটিল্য আর এক জায়গায় লিখেছেন— যে-সব পররাষ্ট্রীয় রাজা ভীষণই শক্তিমান— পারিভাষিক ভাষায় যাঁদের নাম 'মধ্যম' বা 'উদাসীন', তাঁরা সাধারণ এক বিজিগীষু' রাজার কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠান এবং সেখানে এই রাজা যদি বোঝেন যে, শক্তিমান মধ্যম-উদাসীন তাঁর নিজের কাজ হয়ে গেলেও তাঁর সৈন্য ফেরত দেবেন না, তিনি সৈন্যদের আত্মসাৎ করবেন, তাহলে তিনি যে-কোনো ছলনায় সৈন্য পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন। তিনি আবারও ছলনার আশ্রয় নেবেন— যদি বোঝেন যে, তাঁর সৈন্যদের খারাপ জায়গায় যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে, অথবা তাদের পাঠানো হবে অন্যতম আটবিক পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অর্থাৎ এখানে তাঁর সৈন্য ধ্বংস হবে বুঝেই ছলনা করতে হবে। কিন্তু এমন যদি বোঝেন যে, শক্তিমত্ত রাজার অনুরোধে নিতান্তই সৈন্য পাঠাতেই হবে, নইলে অন্য বিপদ বাড়বে, তাহলে তিনি সেই আগের মতোই শত্রুসৈন্য অথবা আটবিক সৈন্যদেরই পাঠাবেন— যারা মারা গেলে রাজা কোনো ক্ষতি অনুভব করবেন না, বরঞ্চ একভাবে খুশিই হবেন— মৃত্যু-অমিত্র-অটবী-দণ্ডং বা অস্মৈ দদ্যাৎ।

এটা থেকে আটবিক 'ফরেস্ট ট্রাইবস্'-এর ওপর রাষ্ট্রবিদ চিন্তকদের মানসিকতাটা বোঝা যায়। সামরিক বৃত্তিতে নিষ্ণাত হওযা সত্ত্বেও সমর-কুশল আটবিকরা যদি অন্যতম কোনো যুদ্ধে ক্ষয় হয়ে যায়, তাহলে রাজা ভাববেন যে, তাঁর নিজের রাজ্যের আপদ কিছু কমল। আমরা মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বহুতর আটবিক সৈন্য এবং আটবিক রাজাদের দুই পক্ষেই যুদ্ধ করতে দেখেছি। মহাভারতের কবি আটবিক গোষ্ঠীগুলির নির্দিষ্ট নাম করে-করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা বড়ো বড়ো মহাভারতীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন এবং সেই লড়াইতে বৃহদ্ ব্যক্তিত্বের হাতে সৈন্যক্ষয় ছাড়া কিছুই হয়নি। অর্থাৎ এখানেও সেই ব্যবহার করাটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, বিশ্বাসের চেয়ে। অপর মহাকাব্য রামায়ণে এ-সব বালাই নেই, রাক্ষস-বানর ছাড়া আর যে দু-চারটি জনজাতি আটবিকে নাম পাওয়া যায়, তাদের কোনো রাজনৈতিক ব্যবহারের কথা সেখানে পাওয়া যায় না। মহাভারতে আটবিক জনজাতির 'পোলিটিক্যাল ইউজ' এত বেশি বলেই কৌটিল্যেও সেই ধারা বজায় আছে। কৌটিল্যে যেটা খুব প্রকট হয়ে ওঠে, সেটা হল— যে-কোনো প্রান্তদেশ যেন একটা উপদ্রবের জায়গা। রাজ্যের প্রান্তদেশ মানেই চোর-ডাকাতের উপদ্রব, অথবা আটবিকদের উপদ্রব। অথবা আটবিকদের উপদ্রব। তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক ঝগড়ার সূত্রটাও এইখানেই।

মহামতি কৌটিল্যের আচার্যস্থানে যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ যাঁরা কৌটিল্যের থেকেও প্রাচীন রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, তাঁদেরও একটা তাত্ত্বিক ধারণা ছিল আটবিক অরণ্যচারীদের সম্বন্ধে। তাঁরা ভাবতেন— রাষ্ট্রের পীড়া তৈরি করে এইরকম চোর-ডাকাত-লুঠেরা, যাদের highway robbers বলা যায়, তারা আটবিকদের থেকে অনেক বেশি রাষ্ট্রপীড়া তৈরি করে।

আচার্যদের ধারণা— লুঠেরা-ডাকাতেরা রাত্রেই তাদের কাজ করে, তারা 'সত্রচর' অর্থাৎ দস্যুবৃত্তি করার জন্য বন-গহনে লুকিয়ে থাকে এবং আক্রমণ করে অসহায় মানুষকে। এরা রাষ্ট্রের কাছে সব সময়েই একটা অস্বস্তি তৈরি করে রাখে। এর যেহেতু প্রতিনিয়ত নির্বিচারে মানুষের টাকা-পয়সা, সোনা-দানা ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাই সব সময়েই রাষ্ট্রীয় শাসকদের ওপর এখটা চাপ তৈরি করে এবং সে চাপটা তৈরি হয় অন্যান্য রাষ্ট্রমুখ্য বা প্রধান ব্যক্তিরা এই দস্যুবৃত্তিতে শাসকদের ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন বলে। আচার্যদের মতে— এই তুলনায় আটবিকরা অনেক ভালো। প্রথমত, তারা রাষ্ট্রের মূল ভূমি থেকে অনেক দূরে থাকে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের অরণ্যে থাকে বলে (in forests on the frontiers for away) তারা নিজেরা অনেক অশুভ কাজে যুক্ত থাকলেও নিকটবর্তী গ্রাম এবং শহরের লোকদের কাছে মোটামুটি পরিচিত থাকে, তারা চলাফেরাও করে সমস্ত মানুষের চোখের সামনে। নিজেদের অন্ন-পানের সংগ্রহ

অথবা জমি-জায়গা নিয়ে বিবাদ করে, এরা রাজ্যর একাংশে অবস্থিত, বলা ভালো প্রান্তিক গ্রামের দু-চারজন লোককে এরা মেরে ফেলে বটে, কিন্তু এরা কখনও বহু লোকের হত্যাকারী হয় না।

কিন্তু কৌটিল্য তাঁর আচার্যদের এই মত মানেন না। তিনি ব্যাপরটা সব সময় পোলিটিক্যালি দেখছেন। তিনি বলেছেন— লুঠেরা-ডাকাত— দস্যুদের মতো লোকেরা যারা রাষ্ট্রের পীড়া তৈরি করে, তারা সেই সব লোকেরই টাকা-পয়সা, সোনা-দানা ছিনিয়ে নেয়, যারা 'অনবহিত' অর্থাৎ যারা negligent and careless— কিন্তু লুঠেরা-ডাকাতদের সংখ্যা সব সময়েই অল্প এবং আটবিকদের তুলনায় তারা আপন বৃত্তির জন্যই অনেক বেশি কুণ্ঠাগ্রস্ত এবং দুর্বল। ফলে তাদের খুঁজে বার করতে সময় লাগে না, তারা সামান্য চেষ্টাতেই ধরা পড়ে যাবে রাজপুরুষদের হাতে। কিন্তু লুঠেরা-ডাকাত-দস্যুদের সঙ্গে প্রতি তুলনায় আটবিকেরা কিন্তু নিজের নিজের দেশেই অবস্থান করে, লুঠেরা-ডাকাতদের মতো তারা এখানে-ওখানে, এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ায় না দস্যুবৃত্তির জন্য, কিংবা দস্যুবৃত্তির কুণ্ঠায়। তা ছাড়া আটবিক অরণ্যচারীরা সংখ্যায় অনেক এবং তারা ভয়ংকর সাহসী এবং বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তি— স্বদেশস্থা প্রভূতাঃ বিক্রান্তাশ্চাটবিকাঃ। সেই দিক থেকে ভাবলে আটবিক রাজ্য অনেকটাই শত্রুরাজ্যের মতো— শত্রু রাজাদের মতোই তারা প্রকাশ্য যুদ্ধ করে, দেশের লোকের ধনও অপহরণ করে এবং স্বপ্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাধা পেলে মেরেও ফেলে অনেককে—প্রকাশযোধিনঃ অপহন্তারঃ হন্তারশ্চ। এদের ক্ষমতা প্রায় শত্রু বা অমিত্র রাজার মতোই। অতএব রাষ্ট্রের পক্ষে এরা অনেক বেশি বিপজ্জনক— এটাই কৌটিল্যের মত।

খ্রিস্টপূর্ব মোটামুটি এই চতুর্থ শতাব্দীর দলিল থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, বনবাসী আটবিকদের সঙ্গে 'মেইনস্ট্রিম' রাষ্ট্রশক্তির সম্পর্কের মধ্যে চিরকালই একটা সংশয় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস কাজ করছে। রাজশক্তি এঁদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, দরকারে খারাপ কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু এঁদের শক্তিক্ষয়ে নিজে কখনও যুক্ত হয়নি রাজনৈতিক কারণেই, অথচ তাঁদের শক্তিক্ষয় করার জন্য অন্য বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে মরার জন্য মিত্র-রাষ্ট্রের সহায়তায় পাঠানো হয়েছে এঁদের, আবার এমনও হয়েছে যে, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে আটবিক-সৈন্যদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে শত্রুদের হাতেই। শেষ কথাটা তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে, প্রাচীন প্রাতিষ্ঠানিক রাজারা এঁদের বিশ্বাস করতেন পারছেন না কখনও। ফলত স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি প্রান্তিক তথা প্রান্তবাসী আরণ্যক সহচর হওয়া সত্ত্বেও রাজারা কখনও তাঁদের আপন মৌল রাজনীতির পরিসরে রাজনৈতিক কোনো স্থান নির্দেশ করছেন না।